বঙ্গবীর ওসমানীর সঙ্গে কথোপকথন

মেজর মোঃ মোখলেছুর রহমান (অব.)

বঙ্গবীর ওসমানীর সঙ্গে কথোপকথন

মেজর মোঃ মোখলেছুর রহমান (অব.)

আহমদ পাবলিশিং হাউস

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় বীর মুক্তিযোদ্ধা

মেজর জেনারেল (অব.) কে. এম শফিউল্লাহ, বীর উত্তম, পিএস,সি

নিবেদন

বঙ্গবীর এম এ জি ওসমানীর সঙ্গে পাকিস্তানে অনেকবার দেখা হয়েছে। তিনি যখন যা বলতেন লিখে রাখতাম। লায়ালপুর সেন্ট্রাল জেলে থাকা অবস্থায় ১৯৭৩ সালে কর্তৃপক্ষ আমাদের (বাঙালির) সব লেখা নিয়ে একটি কক্ষে স্তূপ করে রাখে। ঐ রুমেই বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ বন্দি ছিলেন। লেখাগুলি আমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি।

স্বাধীন বাংলাদেশে ওসমানীর সঙ্গে কয়েকবার দেখা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আলাপের কিছু কিছু নোট করতে সক্ষম হই এবং সেগুলি কম্পিউটারে প্রিন্ট করতে দিই। কিন্তু অপারেটর সেগুলি নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে গাজিপুর থেকে নষ্ট অবস্থায় কিছু লেখা উদ্ধার করি। উদ্ধারকৃত লেখাগুলি ***বঙ্গবীর ওসমানীর সঙ্গে কথোপকথন*** নামকরণ করা হলো।

ওসমানীর প্রতি পাকিস্তান খুব অন্যায় করেছিল। বাংলাদেশ সরকারও তাঁকে সঠিক মূল্যায়ন করেনি। যখন ভাবি, তখন মনটা ভারাক্রান্ত হয়।

ওসমানী অনেক কিছু লিখেছেন। তার লেখাগুলি উদ্ধার করে প্রকাশ করলে দেশবাসী উপকৃত হবে। অনেক অজানা তথ্য জানা যাবে। তাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হউক - দেশবাসীর নিকট এই আবেদন রাখছি।

এই বইটি বর্ণবিন্যাসে সাহায্য করার জন্য সার্জেন্ট মোহাম্মদ আবদুর রহিম (অব.) এবং মাসরুর ফুয়াদ ইকবাল (শাওন) তাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

মেজর মোঃ মোখলেছুর রহমান (অব.)

বঙ্গবীর ওসমানীর সঙ্গে কথোপকথন

জুলাই
১৯৫৮

২৩ জুলাই। বিকালে রাওয়ালপিন্ডির জিটি রোডে হাঁটছি। হঠাৎ আলী[১] বলে ওঠে, 'ঐ দেখ ওসমানী'। আর্মিতে ভর্তি হবার আগে আমি তাঁর নাম শুনিনি। চট্টগ্রাম ইবিআরসি হোলডিং শাখায় অবস্থানকালে ওস্তাদ সুলতান, শামসু, আকবর আলী, তাজুল ইসলাম[২] প্রমুখের মুখে তাঁর নাম অনেকবার শুনেছি। আলীর কথায় অবাক হলেও সাহস করে এগিয়ে গেলাম। সালাম দিলাম তাঁকে। উনি ফিরে তাকালেন, মাথা নেড়ে হাত ইশারায় কাছে ডাকলেন। কাছে গিয়ে পরিচয় দিলাম। উনি বললেন, তোমরা এসেছো, খুব খুশি হয়েছি। খুব উৎসাহ নিয়ে মনোযোগ দিয়ে কাজ করবে, ছুটি গিয়ে আরো ছেলেকে আর্মিতে ভর্তি হতে বলবে।

উনি চলে গেলেন। এরপর সেপ্টেম্বর মাসে রাওয়ালপিন্ডি অফিসারস ক্লাবে আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন হাবিলদার মমতাজ উদ্দিন[৩] (কর্নেল শামসুদ্দিনের পিতা) আমাদের মুখপাত্র হিসেবে আলী তাঁর সঙ্গে কথা বললেন। আমরা ৫-জন রিক্রুট: আমি, মমতাজ, আলী আহমেদ তালুকদার, সোবহান ও বশর। তিনি এক এক করে সবার সঙ্গে কথা বললেন। আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল, আমরা রাওয়ালপিন্ডি যাবার পর ২-মাস হয়েছে, কিন্তু আমাদের প্রশিক্ষণ শুরু হচ্ছে না, তা তাঁকে জানানো। গুজব শুনছি, আমাদের ফিরিয়ে দিবে। ইতোমধ্যে দশ জন বুদ্ধি পরীক্ষায় ফেল করায় দেশে ফিরে এসেছে। বুদ্ধি পরীক্ষায় ফেল শুনে তিনি নাক সিটকালেন, 'হোয়াট ননসেন্স'। বললেন, তোমাদের প্রশিক্ষণ সত্বর শুরু হবে। ট্রেনিং সেন্টার নিয়ে সমস্যা ছিল। পাকিস্তান হবার পর মাত্র ২-বার স্বল্প সংখ্যক বাঙালি এসিসিতে (আর্মি কোর অব ক্লার্ক) ভর্তি করেছে। আলী বললো, 'স্যার, আমি ভর্তি হবার জন্য আগেও দু-বার চেষ্টা করেছি।'

তোমরা তো জান না, পাকিস্তান হবার পর এরা বাঙালি ভর্তি বন্ধ করে দেয়। এবার সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নির্দেশে বাঙালি ভর্তি শুরু হয়েছে। এরা চায় না আর্মিতে বাঙালি ভর্তি হোক। আবার আমাদের ছেলেরাও কষ্ট করতে চায় না। মনে রাখবে, সেনাবাহিনীতে বাঙালি না থাকলে বাঙালির কোনো উন্নতি হবে না। সেনাবাহিনীই হলো দেশে বড়ো শক্তি। তিনি বদর, ওহুদ, হোদায়বিয়া, পারশ্যের যুদ্ধ, পানিপথের যুদ্ধ, বারো ভূঁইয়াদের যুদ্ধের কথা বললেন। যত কষ্টই হোক, তোমাদের

চাকরি করতে হবে। ইস্ট পাকিস্তানে তো চাকরি নেই, সব বিহারিরা দখল করেছে। তোমরা নতুন, সেনাবাহিনীর অনেক কিছু জান না, আস্তে আস্তে সব জানতে পারবে। আমাদের দেশের অবস্থা খুব খারাপ। তোমরা কখনো কেউ বলবে না, চাকরি করব না। এরা চায়, সেনাবাহিনীতে বাঙালি না থাক, সুযোগ পেলেই একজনকে ফিরিয়ে দেয়, তার জায়গায় একজন পাঞ্জাবি ভর্তি করে।

আমি বললাম, স্যার যুক্তফ্রন্টের ২১-দফায় বাঙালি ভর্তির দাবি ছিল।

তা ছিল, কিন্তু এরা সেটা মানে না। সুযোগ পেলেই বাঙালিকে বাড়ি পাঠায়, তার জায়গায় এদের লোক ভর্তি করে।

সোবহান[৪] বলে, স্যার এখানে আমরা কত বাসা দেখেছি, সব পাঞ্জাবি, একটাও বাঙালি না। এদের অনেক জেনারেল আছে, বাঙালি জেনারেল নেই ?

না নেই । দেশের মানুষ তো এসব জানে না। বাঙালি জেনারেল, বাঙালি সচিব না হলে ইস্ট পাকিস্তানের কোনো উন্নতি হবে না।

আমি বললাম, এরা তো আমাদের সংগে ভালো ব্যবহার করছে না, বাংলা বাবু বাংলা বাবু বলে। কেমন সব হাসি ঠাট্টা করে।

এরা যে যা বলুক, ধৈর্য্য সহকারে তোমাদের চাকরি করতে হবে। এটা বাঙালির হক। আর হক আদায় না করলে কেউ এমনিতেই দিয়ে যাবে না। তোমরা যখনই পূর্ব পাকিস্তানে যাবে, দেখবে সেখানকার সব চাকরিতে পাঞ্জাবি বিহারি। লেখাপড়া শিখে বাঙালি চাকরি পাচ্ছে না। হাজার হাজার বেকার। আর এরা আমাদের জায়গায় চাকরি করছে। ভিতু বাঙালি বলে গালাগাল দিচ্ছে। বাঙালি সেনাবাহিনীতে ঢুকতে চায় না বলেই তো এরা সুযোগ পাচ্ছে।

আমি বললাম, এটা বোধ হয় ঠিক নয় স্যার। নওগাঁতে আমাদের সাথে ভর্তি হবার জন্য কয়েক হাজার লোক এসেছিল। দু-দিনে মাত্র ৭৫ জন ভর্তি করল। বহু ছেলে হতাশ হয়ে ফিরে গেছে।

ওখানে বাঙালি অফিসার ছিল, ভ্যাকান্সি যা ছিল তাই ভর্তি করেছে। ভর্তি হবার পর যারা চাকরি করবে না, তাদের জায়গায় সেন্টারে এদের লোক ভর্তি করবে। ইবিআরসি ছাড়া সব ট্রেনিং সেন্টার-এ তা পারে। তা-হলে বোঝ, ক্ষতি কার।

বললাম, স্যার ভর্তির সময় দেখলাম, ডাক্তার[৫] সাব খুব ঘ্যাট-ম্যাট করে কিন্তু আর, ও.[৬] সাব ভালো ছিলেন।

ওসমানী হেসে বললেন, দু-জনই ভালো। ডাক্তারিতে ফিট না হলে ভর্তি করা ঠিক হবে না। সেন্টারে আরেকবার ডাক্তারি পরীক্ষা হবে। তখন দোষ পেলে বাড়ি ফিরিয়ে দিবে। লোকসান হবে বাঙালির। কারণ তার জায়গায় সেন্টারে পাঞ্জাবি-পাঠান ভর্তি হবে। তাই বলি, একবার ভর্তি হতে পারলে আর ছেড়ে যাওয়া চলবে না। সেনাবাহিনীতে অনেক সুযোগ-সুবিধা, যা বাইরে নেই। তোমাদের মধ্যে যারা আই-এ, বি-এ পাশ আছো তাদের অফিসার হবার চেষ্টা করতে হবে। চার বছর পর বাঙালি সৈনিক ভর্তি শুরু হয়েছে। ট্রেনিং-এর সময় কষ্ট হবে, প্রশিক্ষকরা কষ্ট দিবে; সে-জন্য

ভয় করলে চলবে না। কোনোক্রমেই ট্রেনিং খারাপ করা চলবে না। মনে রাখবে আমাদের বাঙালি নেতারা অনেক সংগ্রাম করে বাঙালি ভর্তি শুরু করেছে। ব্রিটিশ-রা যেমন বাঙালি ভর্তি না করে পাঞ্জাবি, মারাঠা, রাজপুত, বিহারি ভর্তি করতো, এরাও তেমনি বাঙালি ভর্তি করতে চায় না। নিজেদের লোক ভতি করে।

বললাম, স্যার, এদের নাকি ২০ জন জেনারেল আছে। বাঙালি একজনও নেই । তিনি বললেন, হাঁ একজন ছিলেন, এখন কেউ নেই। তোমরা ভালোভাবে চাকরি করো। একসময় সব বুঝতে পারবে, জানতে পারবে।

আলী বললো, তাহলে এদের সংগে থেকে লাভ কি? একজনও বাঙালি জেনারেল নেই, আর এরা এতো ? আপনি স্যার এদের ছেড়ে চলেন, আপনাকে আমরা জেনারেল বানাবো। এরা বাঙালি দেখতে পারে না। আমাদের নেতাদের দাবিই ঠিক ।

ওসমানী আলীর মুখের প্রতি চেয়ে অনেকক্ষণ পর বললেন, এভাবে হবে না। তুমি কোথায় লেখাপড়া করেছো ?

চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে স্যার। বিএ পাশ করে কোনো চাকরি পাইনি। এ-সময় পাশের রুম থেকে কে যেন টাইগার টাইগার বলে ডাকছিলেন। ওসমানী বললেন, এখন তোমরা যাও, আবার এসো। আমরা ট্রানজিটে ফিরে এলাম। খুব কাছেই তিনি থাকতেন। হাবিলদার মমতাজ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ওসমানী আমাদের কি বলেছেন তা খুঁটে খুঁটে প্রশ্ন করে জেনে নিলেন। বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা চাকরি করবে না বলছিলে তারা এখন ভেবে দেখো। সুযোগ ছাড়তে নেই। চেষ্টা করলে কমিশনড্ অফিসার হতে পারবে। তোমরা বেশি ঘুরাফেরা না করে পড়াশুনা করো।

মজার ব্যাপার ছিল, সেদিনই সন্ধ্যায় আমরা জানতে পারি, পরের দিন ১২ জনের একটি ব্যাচ AKRF ওঝরি ক্যাম্প রাওয়ালপিন্ডি প্রশিক্ষণের জন্য যাচ্ছে। তাদের মধ্যে মাত্র ২-জন বাঙালি যারা পশ্চিম পাকিস্তানে ভর্তি হয়েছিল অর্থাৎ ইব্রাহিম ও শামসুল হুদা[৭]।

২ মাসের বেশি আমরা ভাত খেতে পাচ্ছি না। সবার মন খারাপ। এক পাঞ্জাবি হাবিলদার প্রতিদিন সকালে এসে আমাদের মার্চ করিয়ে এসিসি রেকর্ড অফিসে নিয়ে যেতেন। মূলত তিনিই আমাদের ট্রানজিট ক্যাম্পে দেখাশুনা করতেন। আমাদের অভাব-অভিযোগ তাকেই বলতাম। একদিন গেটের বাইরে নিয়ে বললেন, তোমরা তো টাইগার ওসমানীর নিকট গিয়েছিলে, তার কাছে আবার গিয়ে ভাতের কথা বলো, কাজ হবে। সেদিনই মাদারিপুরের ফজলুকে নিয়ে গেলাম। টেনিস খেলে সবে তিনি ফিরেছেন। আমাদের কথা শুনলেন, সংগে সংগে ফোন করলেন। বললেন, একবারের বেশি ভাত খাওয়া ঠিক না।

যত বেশি ভাত খাবে তত বেশি ঘুম পাবে। রুটি ভাতের চেয়ে ভালো। তোমরা রুটি খাবার অভ্যস্ত হয়ে বাড়ি গিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের এক বেলা রুটি খেতে বলবে। দুই একদিনের মধ্যে তোমাদের এক বেলা ভাতের ব্যবস্থা হবে।

আমি বললাম, স্যার আমাদের সংগে এক পাঞ্জাবি আছে, তার চাচা ব্রিগেডিয়ার। তাকে OTS পাঠাচ্ছে । আমাকেও সে চেষ্টা করতে বলেছে।

OTS বন্ধ হয়ে গেছে। খোঁজ নিয়ে দেখি, কাল-পরশু এসে জেনে যাবে।

ফজলু বললো, স্যার পাঞ্জাবিরা আমাদের ভালো চোখে দেখছে না, কেমন ভাবে যেন তাকায় আর কি সব বলে। গতকাল CORO (সেন্ট্রাল অফিসার্স রেকর্ড অফিস)-তে এক সুবেদার সাহেব বলছিলেন, আমাদের ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করবে। এরা সোহরাওয়ার্দীকে খুব গালাগালি করে।

ওসমানী মৃদু হাসলেন, বললেন এই তোমরা চাকরি করতে এসেছো, তোমরা না এলে তোমাদের জায়গায় এদের লোক চাকরি পেত। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের জন্য তারা তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সে জন্য তাকে গালাগালি দিচ্ছে। উনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে বাঙালির ভর্তি ব্যবস্থা করেছেন। এদের কথায় মন খারাপ করবে না। সামনে নির্বাচন হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

বললাম, নির্বাচন হবে না স্যার।

হবে না মানে, এই তো সামনের ফেব্রুয়ারিতে সাধারণ নির্বাচন। বললাম, হবে না স্যার। গতকাল পিওন দিত্তা খান বলেছে, ইলেকশন না হোচি, কাইয়ুম খানকো জেল মে ঠোকেঙ্গে, আওর সোহরাওয়ার্দীকো ফাঁস দেয়েঙ্গে ।

পিওন দিত্তা কে ?

CORO তে আছে স্যার। সেখানে আমরা ৮-জন কাজ করি ।

CORO তে তোমরা কি কাজ করো ? তোমাদের তো ট্রেনিং হয়নি ?

ফজলু বললো, আলমারি থেকে ফাইল বের করি, ভিতরে রাখি, এসব আর কি ?

বললাম, স্যার গতকাল আপনার অফিস দেখেছি। ওদিকে আমাদের যেতে দিল না ।

ওদিকে সি-ইন-সি থাকে। খুব গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। ওদিকে তোমরা যাবে না ।

স্যার, বাঙালি অফিসারেরা সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও প্রমোশন পাচ্ছে না। সুবেদার শাহ আলম সে জন্য খুব দুঃখ করলেন।

হাঁ ভারতে বাঙালি মুসলমানেরাই প্রথম কমিশনড্ অফিসার হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তাদের প্রমোশন হয়নি। এসব আলোচনা করবে না। তোমরা এখন যাও।

আমরা চলে এলাম। ফজলু বলে, এ বেটা কিছুই জানে না। অফিসের পিওন চৌকিদার জানে নির্বাচন হবে না। আর এ বেটা ... ।

তাঁর কাছে আর আমরা যেতে পারলাম না। দু-দিন পরেই আমাদের ওঝরি ক্যাম্প, এ কে আর এফ সেন্টারে সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য যেতে হলো। এ কে আর এফ সেন্টার মূলত কাশ্মিরীদের রিক্রুট ট্রেনিং সেন্টার। সেখানে আমাদের সামরিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা হয়। সেখানেও ভাত খাবার ব্যবস্থা ছিল না। ওসমানীকে আমি এ জন্য একটি পত্র দিলাম।

পনেরো দিন পর এক বেলা ভাতের ব্যবস্থা হলো। সেখানে এক দলে আমরা ১০ জন বাঙালি, ২ জন পাঠান এবং ২ জন কাশ্মিরী ছিলাম। ৬ অক্টোবর ১৯৫৮ রাতে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হয়। পরদিন বিকালে আমরা জানতে পারি। ওটা জঙ্গলি শাসন হলেও পাঞ্জাবিরা খুব খুশি হয়। প্রতি সন্ধ্যায় রোল কলে একজন জেসিও/অফিসার এসে সামরিক শাসনের পক্ষে নানা যুক্তি দিয়ে সৈনিকদের বুঝাতেন। প্রশিক্ষকেরা (সবাই কাশ্মিরী) ঘুরে-ফিরে একই কথা বলতেন। সত্বর কাশ্মির তারা পেয়ে যাবে বলে আনন্দ প্রকাশ করতেন। পাকিস্তান এখন খুব উন্নতি করবে বলে তারা খুব আশাবাদী ছিলেন। শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী, আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিবকে তারা খুব গালাগালি করতেন। আমরা চুপচাপ শুনতাম। এ-সময়ে আমি এডল্‌ফ হিটলার বইটি পড়ছিলাম। পড়তে পড়তে কেন জানি আমার মনে হচ্ছিল খুব শীঘ্রই পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে যাবে। বন্ধুবর নূরকে এবং সৈয়দ দাদাকে সে কথা লিখেছিলাম তখনই। ওদিকে কেন যেন মনে হচ্ছিল, ওসমানীকে পত্র লেখার জন্যই ভাতের ব্যবস্থা হয়েছে কিন্তু চিঠির কথা কাকেও বলিনি। এরপর ওসমানীকে আমি অনেক পত্র দিয়েছি কিন্তু কোনোটার কোনোদিন জবাব পাইনি। ট্রেনিং শেষে ট্রানজিট ক্যাম্পে ফিরেই আমি আর সোবহান পিন্ডি ক্লাবে গেলাম। আমাদের দেখে তিনি খুশি হলেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দশ-বারো মিনিট কথা হয়। বললাম, স্যার এরা বাঙালি নেতাদের খুব গালাগাল করছে।

ওরা কি বলে ?

বললাম, বাঙালি নেতারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের সঙ্গে যোগসাজস করছে। সোহরাওয়ার্দী নাকি আমেরিকার সঙ্গে গোপন চুক্তি করেছে। কাশ্মির ভারতকে ছেড়ে দিবে। পরে পূর্ব পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে মিলে যাবে।

তোমরা ওসবে মন দিও না। ওরা যা বলার বলুক। বাঙালিরা জানে কে কি করেছে। নির্বাচন বাঞ্চাল করার জন্যই এরা সামরিক শাসন জারি করেছে। নির্বাচন হলে সোহরাওয়ার্দী ক্ষমতায় যেতেন, সেটা ওরা হতে দিল না। এটা ওদের বড়ো ধরনের ষড়যন্ত্র। সোবহান বললো, স্যার প্রতিদিন একই কথা শুনতে ভালো লাগে না। সহ্য হয় না।

এসব পুরাতন কথা। বাঙালিরা সব জানে। এ নিয়ে মন খারাপ করার কিছু নেই। তোমাদের ট্রেড কোর্স কবে ?

আমরা জানি না স্যার।

তোমরা ট্রেনিং শেষে আবার এসো। এখন যাও।

ফেব্রুয়ারি
১৯৫৯

আমরা ট্রানজিট ক্যাম্প রাওয়ালপিন্ডি দু-মাস বসে বসে রইলাম। ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯ সাল। আর্মি স্কুল অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কুলডানা মারী হিলস ট্রেড কোর্স করতে গেলাম। সেখানে ৩০০-জনের মধ্যে ৭০-জন বাঙালি ছিলাম। সবাই প্রাণ খুলে

আলাপ করতাম। পাঞ্জাবিদের মতলব আমরা সবাই বুঝে গেলাম। কোর্স শেষে ট্রানজিট ক্যাম্পে ফিরে এসে সবাই ছুটি পেল। আমার যাবার জায়গা ছিল না বিধায় ১০৫-ব্রিগেড বাহাওয়ালপুর চলে গেলাম। যাবার আগে ওসমানীর সঙ্গে দেখা করলাম। সব শুনে খুব খুশি হলেন। বললেন, এভাবে দশ বছরে যদি বাঙালির সংখ্যা ১০% হয়, আমাদের দেশের অবস্থা অন্যরকম হবে। এখন তো আধা পারসেন্টও বাঙালি নেই। বললাম, এডল্‌ফ্‌ হিটলার বইটি পড়ে মনে হলো, কোনো দেশে যখন ডিক্টেটরশীপ চলে, তখন সে দেশের একটা না একটা অঙ্গ হানি হয়। সে হিসেবে তো এখন পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে যাবে।

এখন এসব আলাপ করার সময় নয়। মনোযোগ দিয়ে কাজ করো। লেখাপড়া করবে। প্রমোশন পরীক্ষায় পাশ করবে। তবেই একদিন দেখবে আমাদের অবস্থা ঘুরে দাঁড়াবে। তোমাদের আলী কোথায় গেল ?

রিক্রুটিং অফিস ঢাকায় স্যার।

তবে তো ভালো। ওপারে কতজন গেল ?

৪ জন স্যার।

বাহাওয়ালপুরে যোগদান করার ঠিক দু-মাস পর আমাকে সেনাসদরে অস্থায়ী কাজের জন্য পাঠান হলো। এ কাজটি কোরোতেই শুরু হয়েছিল। পিন্ডি যাবার পর আমি উর্দুর প্রতি রাগ করে বেশি সময় ইংরেজিতে কথা বলতাম। ওরা বোধ হয় সেজন্য আমাকে পছন্দ করেছিল। প্রধান সেনাপতির নিকট বাংলা চিঠিপত্র মাঝে মাঝে যেত। সেগুলি ইংরেজি করা। আগে কম ছিল। সামরিক শাসন শুরুর পর সংখ্যা বাড়ে। আইয়ুব খানকে লেখা এসব দরখাস্ত ইংরেজি করতে দশ-বারো দিন লাগল। এরপর প্রতিদিন ৪/৫ টা দরখাস্ত সেনা প্রধানের অফিস থেকে একজন অফিসার নিয়ে আসতেন। এএজি (অ্যাসিসট্যান্ট অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল) সাহেব আমাকে ডেকে নিয়ে সে-সব দিতেন, ছুটির আগে এসে ঐ অফিসার নিয়ে যেতেন। অনেক শব্দের ইংরেজি মানে আসতো না। একটা কিছু লিখে দিতাম। তারপর সে সবের কি হতো আমি কোনোদিন জানতে পারিনি। আমাকে প্রথম দিনই বলা হয়েছিল, এসব যেন কাউকেও না বলি। আমি বলিনি। ১৯৭১ সনের শুরুতে এটা বন্ধ হয়ে যায়।

যাক সে কথা। পিন্ডি এসে এবার ভালো লাগল। অনেক কোর্সমেট। বিকাল বেলা ফ্রি। তাই ওদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করতাম। পাক আর্মিতে এ সুবিধা আমি ছাড়া আর কেউ বোধ হয় পায়নি। সেই ১৯৫৮-১৯৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমি ঘুরে ফিরে রাওয়ালপিন্ডি থেকেছি। তাই ওসমানীর সঙ্গে আমার চেয়ে বোধ হয় বেশি কেউ দেখা-সাক্ষাত করতেও পারেনি। আবার এ-সময় তিনিও পিন্ডিতেই ছিলেন। তাঁর উৎসাহেই আমি বিএ,এমএ, ল' পড়েছি। ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ২/৩ দিন পর পর তাঁর কাছে গিয়েছি। তাঁর চেষ্টায় পাকিস্তান আর্মিতে বাংলা টাইপ রাইটার (একটা) কলকাতা থেকে আর্মি অ্যাপ্রেন্টিস স্কুলে নেওয়া হয় ১৯৬৪ সালে। প্রথমে আমি সেটা মেসে নিয়ে কয়েকদিন প্র্যাকটিস করি। তারপর ঐ স্কুলের জন্য সব ধরনের

বাংলা প্রশ্ন টাইপ করে দিতাম। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বে বাঙালি সৈনিকরা বাংলা টাইপ রাইটারের কথা জানতো না। একদিন ওসমানী বললেন, এভাবে আর্মিতে বাংলা প্রবর্তন করতে হবে। অবাঙালি অফিসারদের বাংলা কোর্স এবং প্রশ্নপত্র টাইপ করে চালু করতে হবে। বললাম, এ জন্য এমটি (মিলিটারি ট্রেনিং) পরিদপ্তরে একটা বাংলা সেল প্রতিষ্ঠা করা দরকার। উনি খুব খুশি হলেন। বললেন, ওয়াসির সঙ্গে পরামর্শ করবো। PMA -তে বাংলা প্রবর্তন করা দরকার। এরা তো বাংলা তুলে দিতে চায়।

উনি অবসর গ্রহণ পর্যন্ত চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বাংলা সেল প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি।

’৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পর পাক আর্মির ব্যাপক অবকাঠামোগত পরিবর্তন হয়। সেনা সদর (GHQ) তে কয়েকটি নতুন পরিদপ্তরের সৃষ্টি এবং এ-সবে একশত ভাগ কমব্যাট (সেনা সদস্য) অথরাইজ করা হয়। যে-সব সিভিলিয়ান অবসর গ্রহণ করবে তার স্থলে কমব্যাট নিয়োগ হবে। ১০% এর বেশি বেসামরিক জনবল থাকবে না। পারসোন্যেল পরিদপ্তরে (পি.এস.) বাংলা দরখাস্ত ইংরেজি করা ছাড়াও আমাকে মিলিটারি পেনশনের কাজ করতে হতো। মিলিটারি পেনশন বেসামরিক লোকেরা দেখাশুনা করতেন। আমার কাজ শেষ হতেই ওরা হিংসে করে আমাকে পেনশনের চিঠিপত্র টাইপ করতে দিত। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৫ সাল, এ-সময়ে মিলিটারি পেনশনের একটা ধারণা আমার হয়। ১৯৬৫ সালে পিপিএ (পে, পেনশন এবং অ্যাকাউন্টস) পরিদপ্তর খাড়া হলো। সৈনিক হিসেবে মিলিটারি পেনশন পলিসি আমার দায়িত্বে দেওয়া হলো। ১৯৭২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমিই ওটা পরিচালনা করেছি। ফলে সেনানীতি নির্ধারকদের কাছে থাকার একটা বিরল সুযোগ আমারও হয়েছিল। জেনারেল ওয়াসিউদ্দিন যেমন সারা বাঙালির প্রতিনিধি ছিলেন, আমিও সারা পাকিস্তানের মিলিটারি পেনশনের পলিসির জন্য প্রতিনিধিত্ব করতাম। সে-সূত্র ধরেই সেনাসদরের পিএসও (প্রিন্সিপ্যাল স্টাফ অফিসার)দের দৃষ্টিগোচর হতে পেরেছি। তাই যখনই কোনো উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অবসরে যেতেন একদিন-দুদিন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাত-কথাবার্তা হতো, যদিও তাঁর পেনশন ঠিক করা আমার দায়িত্ব ছিল না। পরে বাংলাদেশেও তদ্রূপ ঘটে। কোন জেনারেল কি বলতেন, তা ওসমানীকে বলতাম। উনি শুনে চুটকি নিতেন। আমাকে সাবধান করতেন।

১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে পেনশনের একটি ফরম মুদ্রণের ব্যাপারে GHQ প্রিন্টিং প্রেসে গেলাম। একজন বাঙালি বুক বাইন্ডার পেলাম। তার সঙ্গে আলাপ হলো। ঐ প্রেসে ইংরেজি উর্দু প্রিন্টিং হয়। হঠাৎ করেই মাথায় এলো-এখানে বাংলা মুদ্রণ ব্যবস্থা হতে পারে। সন্ধ্যায় ওসমানীর নিকট গেলাম। তাঁকে বললাম। মুচকি হেসে বললেন, আগামী বছর জেনারেল ওয়াসি MGO (মাস্টার জেনারেল অর্ডন্যান্স) হয়ে আসছেন। তখন মনে করো।

১৯৬৪ সালে তিনি নিজের জন্য একটি ইংরেজি টাইপ রাইটার কিনেছিলেন। তাঁর রুমে বসে টাইপ করে দিতাম। সেনাবাহিনীর কতজনের কত ধরনের সমস্যায় তিনি সহযোগিতা করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। পিয়ন, সৈনিক যে কেউই গেছেন, তার কথা শুনেছেন। দরখাস্ত লিখে টাইপ করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন। অনেককে পথ খরচা দিয়েছেন। অবিবাহিত এ-লোকটি সব বাঙালিকে একান্ত আপন মনে করেছেন। বাঙালির জন্যে সবকিছু উজাড় করে দিয়েও সবার নিকট এমনকি বঙ্গবন্ধুর নিকটও বড়ো আঘাত পেয়েছেন তিনি।

অথচ, ১৯৬৭ সালের জুলাই-আগস্টের কথা। ছুটি থেকে ফেরার পথে হেনা ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। এক-সময় তিনি বললেন, খুব সাবধানে আমেনা বেগমের নিকট যাবি। একটা খাম দিবে, ওসমানীকে দিস। আমেনা বেগমের নিকট থেকে খামটা নিয়ে অনেক ভেবেছিলাম, ভিতরে কি আছে। (১৯৬৬ থেকে ১৯৭৪, মাঝখানের অনেকগুলি বছর অনেক ঘটনা প্রবাহ। তখন তিনি মন্ত্রী, সেই খামটির কথা বললে, হেসে বলেছিলেন, বঙ্গবন্ধুর চিঠি, আমেনা বেগম লিখে দিয়েছিল, "কমান্ডার জেনে খুব কষ্ট পেয়েছে, মর্মাহত হয়নি। আমরা প্রতিবাদ করবো না, তবে এর প্রতিশোধ নিব।" বাংলাদেশের স্বাধীনতা সেই প্রতিশোধ। বঙ্গবন্ধু নিজে তাঁকে জেনারেলের পদোন্নতি ব্যাচ পরিয়ে দিয়েছিলেন)। তখন ৬-দফার আন্দোলন তুঙ্গে। দেশের অবস্থা যা দেখেছি, জেনেছি, তাঁকে বললাম। তবে ভাসানীর উল্টা-পাল্টা কথায় লোকজন খুব বিরক্ত। তাঁকে এসব বলা থেকে বিরত করা দরকার। আমার কথায় তিনি হাসলেন। একটু পরে বললেন, উনি কি বলেন ?

স্যার আমি তাঁর কোনো জনসভায় যাইনি তবে খবরের কাগজে পড়েছি। তিনি বলছেন, ৬-দফা নাকি সিআইএ-এর দলিল।

তাই নাকি ? তাহলে শেখের সঙ্গে সিআইএ'র যোগাযোগ রয়েছে।

আমি জানি না স্যার। দেশের মানুষ তা বিশ্বাস করে না। ভাসানীকে আইয়ুবের দালাল বলছে। আমার গ্রামের মানুষ পর্যন্ত ভাসানীকে দোষারোপ করছে।

ভাসানীকে জিজ্ঞেস করলেই তো হয়। ৬-দফা যে সিআইএ দিয়েছে তার প্রমাণ কি ?

অনেকে তো তাই দাবি করছেন।

৩-দিন আগে ভাসানী বলেছেন, পাকিস্তান সরকার তাকে বলেছে ওটা সিআইএ'র দলিল। তাহলে বোঝ ভাসানীর কতটুকু দোষ।

কিন্তু উনি যে বলে বেড়াচ্ছেন, ৬-দফা কার্যকর হলে পাকিস্তান ভেঙে যাবে। পূর্ব বাংলা আলাদা রাষ্ট্র হবে ? উনারা সংগ্রাম করে পাকিস্তান কায়েম করেছেন, এখন ৬-দফার জন্য তা ভেঙে যাবে।

তোমরা বোঝ না ভাসানী তো ঠিকই বলছেন, **৬-দফা কার্যকর হলে পাকিস্তান ভেঙে, পূর্ব-পাকিস্তান পৃথক রাষ্ট হবে**। এটাই তো এখন আমাদের লোক চায়। চায় না ? পাকিস্তানের সঙ্গে থেকে আমাদের কি লাভ হয়েছে ?

এরা তো পূর্ব পাকিস্তানকে লুটপাট করে খাচ্ছে।

ভাসানী প্রকারান্তরে ৬-দফার পক্ষে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন, তোমরা অবুঝ তাই বুঝতে পার না। তা-ছাড়া আমরা তো দেখেছি, যখনই শেখ মুজিব কারাগারে থাকে তখনই ভাসানী মাঠে নামে। শেখের কাজ তখন ভাসানীই চালায়। যারা বুঝের লোক তারা ঠিকই বোঝে। আচ্ছা তাঁর বিরুদ্ধে শেখ সাহেব কিছু বলেছেন ?

বললাম : না।

কারণ ভাসানীর মনের কথা শেখ জানে, আবার শেখের মনের কথা ভাসানী জানেন। তাদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক।

তা-হলে সরকার ভাসানীকেও বন্দি করবে ?

এতো তাড়াতাড়ি সরকার তাদের চাল ধরতে পারবে না। ভাসানী তো সরকার যা বলছে তাই বলেন, তবে একটু হের ফের করে যা বুঝবার ক্ষমতা ওদের নেই।

স্যার, আপনাকে প্রমোশন দিচ্ছে না ... পিয়নদের মধ্যেও বলাবলি হচ্ছে। কর্নেল সিরাজের সঙ্গে দেখা করলাম। উনি খুব দুঃখ করলেন। ওসমানী তখন আমাকে একটি টাইপ করা কাগজ দিলেন। আমি পড়লাম:

"Remarks by the President"

"I knew colonel Osmani. He has some very good points but he also suffers from some sever limitations. One would have liked him to go up in the ladder, as he is so keen in soldiering, but there is such a thing as the ceeling for a man. He has reached that. He should accept it with good grace.

"President Ayub"

পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের সিদ্ধান্তটি স্বচোক্ষে দেখলাম, পড়লাম, পড়ে বললাম, তার মানে কি এই স্যার, কর্নেলের উপর কোনো বাঙালির পদন্নোতি হবে না?

ঠিক তা নয়, ওয়াসির পদোন্নতি হয়েছে, সিকেন্দার মির্জার হয়েছে, মজিদের হয়েছে ।

কর্নেল হচ্ছেন। কিন্তু বাঙালি ব্রিগেডিয়ার হচ্ছে না কেন ?

আমার পর হবে ।

মনে হয় না স্যার। এ জন্যই লে. কর্নেল এ.টি.কে. হককে ব্রিগেডিয়ার না করে বার্মায় মিলিটারি এট্যাচি করা হলো। সমস্ত বাঙালি সৈনিক আপনার প্রমোশনের জন্য অধীর আগ্রহে দিন কাটাচ্ছে ।

মানুষের সব ইচ্ছা পূরণ হয় না। এজন্য আল্লাহ ধৈর্য্য ধারণ করতে বলেছেন।

ধৈর্য্য, আর কি ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে ... আমি উঠে চলে এলাম। বারান্দায় নামতেই জেনারেল গুল হাসানের সামনে পড়লাম। উনি কার থেকে নামছিলেন। আমি দ্রুত চলে এলাম। কিন্তু বাসাতে মন বসল না। সোজা কর্নেল খলিলের (পরে মেজর জেনারেল) বাসায় গেলাম। ব্যাটম্যান বিরক্ত হলো। তবুও বললাম, স্যারের সঙ্গে দেখা করা জরুরি, বলো ? খলিল সাহেব সাধারণত লুঙ্গি পরে বের হন না। কিন্তু সেদিন খুব রেগে বারান্দায় এসে আমার প্রতি তাকালেন। আমি সালাম দিয়ে ঐ কাগজখান তাঁর

হাতে দিলাম। উনি সব জানতেন কিন্তু আয়ুবের লেখাটি সেদিনই প্রথম পড়লেন। আমার হাত ধরে ড্রয়িং রুমে নিয়ে বসালেন। ব্যাটম্যানকে কি যেন ইশারা করলেন। বাম হাত দিয়ে চোখ মুখ ঢেকে রইলেন অনেকক্ষণ। ব্যাটম্যান চা হাতে ইশারা করলে বললাম, ভাল লাগছে না।

এটা কোথায় পেলে?

স্যার দিলেন।

সাবধানে এর অনেকগুলি কপি করে বাসায় দিয়ে যাবে। চা খাও একটু পরে কর্নেল রুশদি আসবে। মাথা গরম করো না। ধর-পাকড় শুরু হয়েছে। খুব সাবধানে চলাফেরা করবে।

তাঁর বাসা থেকে বের হলাম। নিজ মেস অতিক্রম করে লে. কর্নেল (পরে মেজর জেনারেল) এ আর খানের বাসায় গেলাম। স্যার বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। হাত ইশারা করলেন। সালাম দিলাম। বললাম, ওসমানী স্যারের আর প্রমোশন হবে না।

তার তো রিলিজ অর্ডার হয়েছে অক্টোবর মাসে অবসরে যাবেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। উনি আমার মাথায় হাত রাখলেন। ১৯৪৭-এ দেশটা ভাগ করে ওরা বাঙালির সর্বনাশ করেছে। ইসলামের নামে ওরা আমাদের সর্বসান্ত করছে। মন খারাপ করো না। এদের উপর গজব পড়বে। চা খাবে ?

একটু আগে খলিল স্যারের বাসায় খেয়ে এসেছি। এখন কি হবে স্যার ?

এখন ঘুরাফেরা করো না। সময়টা খুব খারাপ। বাসায় যাও। এর ২-সপ্তাহ পরে ক্লাবে গেলাম। বারান্দায় ব্রিগেডিয়ার শরিফ বসেছিলেন। আমাকে দেখেই চিৎকার করলেন, টাইগার, তোমার বাংলা বাবু এসেছে। বাংলা বাবু কেমন আছে ?

ফাইন স্যার, থ্যাংক ইউ। আমি ব্যাটম্যানের কামড়ায় গিয়ে বসলাম। ওদের মন খারাপ। মনে মনে সবাই আশা করছিল স্যারের প্রমোশন হবে। ক'দিন আগে সিরাজুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেছিল, স্যারকে ইসলামাবাদ বাড়ি করার জন্য আয়ুব খান নাকি বলেছিলেন। ব্যাটম্যান বললো, সুখবর আছে স্যার মন্ত্রী হবেন। আয়ুবের লোকেরা এসে চাপ দিচ্ছে সিলেটে না যেতে।

ঘণ্টাখানেক পরে স্যারের কাছে গেলাম। ৪/৫ পাতার কাগজ দিলেন, বাংলায় টাইপ করতে। বললাম, টাইপ রাইটার তো স্কুলে। ওখানে এখন মেশিন পাওয়া মুশকিল।

তাহলে ইংরেজি করে টাইপ কর। আগে একবার আমাকে দেখাস না হয়।

আচ্ছা বলে আসতে চাইলাম। উনি বললেন, এই তোরা ওকে মিষ্টি দে ? কারা যেন অনেক মিষ্টি দিয়েছেন, তার বাচ্চার জন্মদিনে। আমি মিষ্টি খেয়ে মেসে এলাম। তার দেওয়া কাগজ পড়লাম। জনৈক আবুল হাশেম ও আবুল কাশেম চাকরির জন্য দরখাস্ত। বিরক্ত মনে হলেও ওগুলোর ইংরেজি করলাম। পরদিন ছুটি, ক্লাবে গেলাম। ব্যাটম্যানকে টাইপ রাইটার তার ঘরে আনতে বললাম। ব্যাটম্যান বললো, রিবন খারাপ হয়ে গেছে। আমি বাজার থেকে রিবন এনে মেশিনে লাগালাম এবং টাইপ করে দিয়ে এলাম। পরদিন অফিসে গিয়ে হাবিলদার শের খানকে ওসমানীর রিলিজ অর্ডার

দেখাতে বললাম। ও হেসে বললো, ওটা বোধ হয় বাতিল হবে। তাকে বিশেষ কারণে প্রমোশন দিবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমার বিশ্বাস হলো না। কিন্তু শের খান জানাল, জেনারেল আতিক, জেনারেল গুল হাসান আয়ুব খানকে পরামর্শ দিয়েছেন। টাইগার বাড়ি গিয়ে শেখের সঙ্গে যোগ দিবে। তাহলে মহাবিপদ হবে। তাই বুঝেছ ? শের খান আরো বললো, যদি প্রমোশন না হয় তবে বড়ো কিছু একটা হবে।

সেটা আবার কি ?

প্রেসিডেন্ট চাচ্ছেন ওসমানী এখানেই থাকুন। এলপিআর কালীন সরকারি বাসস্থানে থাকবেন। সরকারই তাঁকে এখানে একটা বাড়ি করে দিবেন। মন্ত্রী বানাবেন। তখন তুমি দোস্ত চাকরি ছেড়ে তাঁর সঙ্গে থেকো, কাজে লাগবে।

সেদিন বিকালে বন্ধু মজিবের (বাংলাদেশে মেজর) কাছে গেলাম। আমাকে দেখেই সে উল্লসিত। বললো, আরে তোমার বস্-ত মন্ত্রী হচ্ছেন। তুমি এবার তার এপিএস হবে। ওসমানীর ব্যাটম্যান, হাবিলদার শের খান যা যা বলেছিল শিক্ষা জেসিও মজিবও তাই বললো। আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর এক ভগ্নিপতি খুব সম্ভব নাম কর্নেল হোসেন, মাঝে মাঝে ওসমানীর নিকট আসতেন। তখন আলাপে বলতে শুনেছি, অবসর নিয়ে বালাগঞ্জে চলে যাব। নির্ঝঞ্ঝাট দিন কাটাব। এখানে থাকার প্রশ্নই উঠে না। প্রায় ২-বছর পর কথাটা আমার মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। মাঝে মাঝে ওসমানীর ব্যাটম্যান আমার বাসায় আসতো। অধুনা আর আসে না। ওদের ধারণা ছিল, আমি কমিশন পাব। সে-জন্যই হয়ত খাতির করতো। এদিকে পিএস পরিদপ্তরের ৩ ও ৪ শাখা ভেঙে নতুন পরিদপ্তর পিপিএ (পে পেনশন অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস) হলো। নতুন পরিদপ্তরে সামরিক পেনশন নীতি, পারিবারিক ভাতা বিভাজন, পেনশন পুনঃস্থাপন, বিদেশে অবস্থানরতদের পেনশন কেসসমূহ আমাকে দেওয়া হলো। প্রতিদিন এক-দেড় ঘণ্টা আমাকে পরিচালক এবং অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেলের সামনে পেনশন বিভাজন কেস নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, তাদের বুঝাতে হয় এবং মঞ্জুরিপত্র ইস্যু করতে হয়। কর্নেল ওসমানী জিজ্ঞেস করতেন, তুই এখন কি করিস।

পেনশন দেখি।

ওটা একটা কাজ হলো?

আমি হেসে বললাম, স্যার যখন পেনশনে যাবেন তখন বুঝবেন ? সেই ওসমানী পেনশনে যাবেন, আমার অফিসে তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হবে ? মনে মনে ভাবি। তারপর সত্যিই একদিন উনি আমাকে বললেন, আমার পেনশন কত হবে ?

আনুমানিক এক হাজার টাকা।

মাত্র।

জি স্যার।

আর এককালীন টাকা।

সেটা কমুটেশন ভ্যালু। আনুমানিক নব্বই হাজার টাকা। তবে পেনশন হিসাব নিকাশ এলপিআর শেষ হলে। স্যার, চারদিকে একটা গুজব চলছে, আপনাকে নাকি ইসলামাবাদে একটা বাড়ি দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আয়ুব খান আপনাকে মন্ত্রী বানাচ্ছেন।

আমি দেশের বাড়ি চলে যাব। ঢাকাতেও থাকবো না।

তাই করুন স্যার। বাঙালি সৈন্যরা চান আপনি দেশে চলে যান এবং দেশের কাজে লাগেন ।

উনি চুপ করে রইলেন। আমি সালাম দিয়ে চলে এলাম। খুব সম্ভব সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭ এর ২৯/৩০ তারিখে উনি সিলেট চলে গেলেন। যাবার দিন উনি আমার মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, সাবধানে থেকো। তাঁর পৈত্রিক নিবাস বালাগঞ্জের বাড়িটা আমার দেখার খুব ইচ্ছা ছিল। এক মাসের ছুটিতে বাড়ি গেলাম। কয়েকদিন পর তাঁর বাড়ি গেলাম। দেখে খুব খুশি হলেন। পিন্ডির কথা জানতে চাইলেন। সাধ্যমতো বললাম। ব্যাটম্যান হক সঙ্গে ছিলেন। তাকে তাড়াতাড়ি নাস্তা দিতে বলে আমাকে বললেন, এখানে দেরি করিস না। রাস্তার মধ্যে কারো সঙ্গে দেখা কাথাবার্তা হয়েছে ?

না স্যার। মেজর খালেদ আমাকে আপনার বাড়ি আসতে নিষেধ করেছিলেন কিন্তু ছুটি এসে আর থাকতে পারলাম না। চলে এলাম ।

এখানে বেশ কজন নিরাপত্তা বাহিনীর লোক রয়েছে, ওরা আমার কাছে কারা আসছে যাচ্ছে তার প্রতিবেদন আয়ুব খানকে পাঠায়। তুই এসব ঝামেলার মধ্যে পড়িস না ।

আমি নাস্তা খেয়েই চলে এলাম। তাঁর বাড়িটা ভালো করে দেখা হলো না। (আজো হয়নি) । ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে তাঁর পেনশন চূড়ান্ত হয়। হাবিলদার সুলতান তাঁর পেনশন মঞ্জুরিপত্র পাঠিয়ে দেন জানতে পারিনি। লে. কর্নেল কোরেশীর ডিও পাঠাতে গিয়ে জানতে পারলাম। খুব সম্ভব ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মসে তাঁর পেনশন বিক্রির মঞ্জুরিপত্র পাঠান হয়। এর মধ্যে মাঝে মাঝে বিবিসি তাঁর কথা বলে। কিন্তু তিনি কি করবেন তা সঠিকভাবে বলেন না। সিলেটের আতাউর রহমান ওসমানীর ভাতা বিক্রির মঞ্জুরিপত্র পাঠানোর পূর্বে দেখালেন। ঐ পত্রের সঙ্গে আমরা দু-জন দু-টি চিট পাঠালাম। "স্যার চেকটি জমা দিয়ে ৬-দফার সংগ্রামে অংশ নিন এবং মুজিব ভাইয়ের হাত মজবুত করুন।" তবে ক-টা দিন আমরা খুব টেনশনে ছিলাম। মঞ্জুরিপত্রের রশিদ পাওয়ার পর নিশ্চিত হলাম। এর মধ্যে সারা GHQ তে হৈ চৈ পড়ে গেছে। ওসমানী শেখের দলে যোগ দিচ্ছেন। সে এক মহাকাণ্ড। অফিসে, ক্যান্টিনে, সবখানে তিনচার পিয়ন চাপরাশি এমনকি অফিসারবৃন্দ একত্র হলে ঐ একই আলাপ আলোচনা। নির্বাচন না হতেই সবার এককথা, ওসমানী প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। প্রেসিডেন্ট হতে পারেন। কিন্তু তাঁকে ডিফেন্স মিনিস্টার করা চলবে না। এসব শুনে আমরা দারুন মজা পেতাম। অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল, জেনারেল আনোয়ারও একদিন আমার উপস্থিতিতে আমার পরিচালককে বললেন, He may have any ministry other than defense. ব্রিগেডিয়ার কাজী বললেন, উনি যদি নির্বাচন করেন এবং জয়ী হন তখন তো উনি যে কোনো মন্ত্রিই হতে পারেন। অর্থ উপদেষ্টা লুৎফর রহমানের বড়ো

মেয়ে ঢাকা থেকে ফিরে জানাল যে ওসমানীর আওয়ামী লীগে যোগদান নিশ্চিত। কর্নেল কোরেশী একদিন হাসতে হাসতে বললেন, বুঝলে রহমান, ওসমানীকে প্রমোশন না দিয়ে এরা এখন হা পিত্তিস করছে।

ওসমানী ঠিক কাজটিই করেছেন। আমি বললাম, স্যার বিবিসি বলেছে, উনি শেখ মন্ত্রিসভায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হবেন। এ-কথায় কর্নেল কোরেশী উল্লাস করে উঠলেন .... ওঃ তবে তো দারুণ হবে। সেদিনই বেলা বারোটায় এজির অফিসে জেনারেল পিরজাদাকে বলতে শুনলাম, "আমি এতো করে বললাম, ওরে প্রমোশন দিয়ে সেনাসদরে আটকে রাখতে, প্রেসিডেন্ট কিছুতেই শুনলেন না। এখন আর হা-হুতাশ করে লাভ কি। ওসমানীকে হাই কমিশনার (অস্ট্রেলিয়াতে) করার প্রস্তাব করা হয়েছিল, তিনি না করেছেন। সবখানে এমনকি মুদির দোকানেও ওসমানী-আলোচনা তখন তুঙ্গে। এ-সময়ে আমি আতা ভাবির হাতে লিখে কারো নাম উল্লেখ না করে রাওয়ালপিন্ডি ইসলামাবাদের অবস্থা উল্লেখ করে তাঁর বালাগঞ্জের বাড়ি পত্র পাঠালাম। এরপর সংবাদ মাধ্যমেই ওসমানীর সম্বন্ধে আমরা অবগত হতে থাকি। **যেদিন বিবিসি জানাল যে ওসমানী আওয়ামী লীগে যোগদান করেছেন। সেদিন পিন্ডির দোকান-পাট-রাস্তা-ঘাটে নীরবতা নেমে এসেছিল। পরিচিতরা আমার প্রতি যেন করুণভাবে তাকাতেন। আমাদের অফিসে তেমন কাজ কাম হয়নি সেদিন।**

ফেব্রুয়ারি
১৯৭৪

সেনাসদরে কাজের প্রচণ্ড চাপ। স্বাধীন দেশ, সশস্ত্র বাহিনীর পুনর্গঠনের কাজ চলছে। সব পরিদপ্তরেই রাত একটা পর্যন্ত কাজ করে। সিরাজ (আগে ওসমানীর ব্যাটম্যান ছিল) আমাকে ওসমানীর নিকট যেতে খুব তাগাদা দিলে আমি তাঁর কাছে যাব কিন্তু কাউকে বলা যাবে না, এ শর্তে রাজি হলাম। ৩রা ফাল্গুন সন্ধ্যায় সিরাজ আমাকে নিয়ে গেল। তখনো তিনি মন্ত্রী। বাড়িতে প্রচণ্ড ভিড়। আমাকে ভিতরে বসিয়ে সে সরাসরি তাঁর কাছে গিয়ে আমার কথা জানায়। অনেকক্ষণ পর তিনি ভিতরে গেলেন। কুশলাদির পর প্রথমেই বললাম, স্যার ভুট্টোকে বাংলাদেশে আসতে দেওয়া ঠিক হবে না। সে ত ধান্দাবাজ। উনি বললেন, আরব রাষ্ট্রগুলি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না, ভুট্টোর মাধ্যমে সেটা পূরণের চেষ্টা চলছে। দেশে এখন কেমন লাগছে। বললাম, স্বাধীনতা বিরোধীরা এখন প্রকাশ্যে বলছে :

(১) আওয়ামী লীগ পাকিস্তান ভেঙে ভুল করেছে।
(২) গ্রামের মসজিদে মসজিদে ইমামরা দেশ স্বাধীন হয়ে সর্বনাশ হয়েছে বলে খুৎবা দিচ্ছে।
(৩) বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে সিকিম বানাচ্ছে বলে গ্রামে গ্রামে প্রচার করছে।
(৪) পাকিস্তান ফেরত সৈনিকরা এখন সরকার বিরোধী অবস্থানে চলে গেছে কারণ তাদের থাকা-খাওয়া পদোন্নতি কোনোটাই হচ্ছে না।

(৫) আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা প্রশাসনের সঙ্গে মিলে দুর্নীতি করছে, ভারতে চোরা-চালানি করছে।
(৬) প্রশাসন আওয়ামী বিরোধী এবং জেএসডির সমর্থনে ঝুকছে।
(৭) জেএসডির সঙ্গে বাম ও স্বাধীনতা বিরোধীরা জোট করছে।
(৮) জিনিসপত্রের দাম ক্রয় ক্ষমতার উর্ধ্বে গেছে।
(৯) এ-মুহূর্তে নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ হেরে যাবে।
(১০) দেশের মানুষ বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতা বলয়ের বাইরে দেখতে চায়।
(১১) দেশে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেছে।
(১২) পাকিস্তানের মতো আর্মিরা ক্ষমতা নিয়ে নিবে।
(১৩) তাবলিগ আর জামাতীরা আর্মির সঙ্গে জোট করছে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সরকার বিরোধী প্রচারণা চালাচ্ছে। লোকজন বিভ্রান্ত হচ্ছে। উনি চুপচাপ শুনলেন। মৃদু হেসে বললেন, এসব সরকার জানে ।

জানে তো এদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন ?

কিছুক্ষণ চুপ থেকে আমার হাত থেকে কাগজের চিটটা নিয়ে হল ঘরে চলে গেলেন। কতকক্ষণ অপেক্ষা করে আমি চলে এলাম। খুব খারাপ লাগল। মনে হলো মন্ত্রী হয়ে তিনিও বদলে গেছেন। পাকিস্তানের মতো নেই। কিন্তু কয়েকদিন পর সিরাজ এসে বললো স্যার যেতে বলেছেন। এ-দিকে লোকজনের কাজ কারবার, আলাপ আলোচনা আমার মোটেই ভালো লাগছিল না। বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহার। যারা জিয়ার সেকটরে ছিলেন।

সিরাজের সঙ্গে গেলাম।

কিরে সেদিন রাগ করে চলে গেলি কেন ?

স্যার, রাগ করার মতো কিছু হয়নি ।

বল এখন কি অবস্থা ?

তাবলিগ কর্মীরা ব্যাপক আলোচনা করে এবং সৈন্যরা তাবলিগ মসজিতে ব্যাপক হারে যাচ্ছে। অনেকে সারারাত থাকে। এটা তো পাকিস্তানেও ছিল না।

ধর্মীয় আলাপ-আলোচনা খারাপ কিছু না, তবে আর্মির শৃংখলার মধ্যে হতে হবে। আচ্ছা এ-ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে সফিউল্লাহকে বলে দিব।

স্যার এখন তো সেনাসদরেও ব্যাপকভাবে আলোচনা হচ্ছে, বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ রাতে স্ব-ইচ্ছায় ধরা দিয়েছেন। তিনি স্বাধীনতা চাননি।

বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা না চাইলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো? তুই তো ভালো করেই জানিস। স্ব-ইচ্ছায় ধরা দেওয়া ঠিক না। ওটাও একটা কৌশল ছিল। বঙ্গবন্ধু মৃত্যু ভয় না করে ওদের মুখোমুখি হয়েছেন। স্বাধীনতার জন্য যা যা করা দরকার তা তো আগেই ঠিক করা ছিল। নিজে মৃত্যুর মুখে রইলেন। সব নেতাদের নিরাপদ স্থানে চলে যেতে বললেন, কোথায় যাবে তাও ঠিক করে দিয়েছেন । ওরা তো মশিউর রহমান (যশোহর) ছাড়া একটি নেতাকেও ধরতে পারেনি। এটা বঙ্গবন্ধুর বড়ো একটা কৌশল

ছিল। তার বাড়ির চারপাশে কমান্ডোরা ২০ মার্চ থেকে অবস্থান নেয়। আমরা তা জানতাম। এটা বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতার জন্যে হয়েছে। ওরা বুঝতেও পারেনি। তারা ভেবেছিল সব নেতা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে থাকবেন, তাদের একসঙ্গে ধরে ফেলবেন। নেতারা ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে ওপারে গেছে, সরকার গঠন করেছে, মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে। যারা এ-সব বলে তারা আসলে স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি। বঙ্গবন্ধুর অনিষ্টকারী। ধান্দাবাজ ।

স্যার, আর্মির ছেলেরা এবং অনেক মুক্তিযোদ্ধাকেও বলতে শুনেছি, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা দেননি, ঘোষণা দিয়েছেন মেজর জিয়া ।

আমি সংসদেও বলেছি, **পরিকল্পনা মোতাবেক বঙ্গবন্ধুই স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়েছেন। সেই ঘোষণা বার্তা হাইকমান্ড অনুমোদন করেছিল। আমি রেকর্ড করে অয়্যারলেসে প্রচার ব্যবস্থা করি। বঙ্গবন্ধু ঘোষিত স্বাধীনতাকে রক্ষার জন্য জিয়া যুদ্ধে যোগদানের ঘোষণা দিয়েছিল। এ বিষয়ে তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে।** এ নিয়ে বাড়াবড়ির কিছু নেই। কোনো সমস্যাও নেই।

স্যার, ২৯শে মার্চ, ১৯৭১ দুপুর বারোটায় আমি অপারেশন পরিদপ্তরে একটা চিঠি আনতে যাই। সুপারিনটেনডেন্ট-এর রুমের হার্ডবোর্ড পার্টিশনের পাশের রুমে কয়েকজনকে আলাপ করতে শুনি। তাদের কয়েকজনকে আমি চিনতাম। তারা বলছিল, বঙ্গবন্ধুকে ইলেট্রিক শক দেওয়া হচ্ছে। আর তখনই সেখানে একটা টেপ করা ঘোষণা শুনতে পাই-Hallow ! Hallow! my dear countrymen, here is a flash message, Bangabandhu has declared the independence of Bangladesh. His message....... ঘর ঘর শব্দ। From today Bangladesh is independent. I call Upon the people of Bangladesh ......| ওরা বারবার বাজায় কিন্তু শেষ করে না। আমি আমার অফিসে ফিরে কথাগুলো নোট করেছি।

পরে তা মেজর (পরে কর্নেল) খালেদকে, লেঃ কর্নেল (পরে মেজর জেনারেল) এ, আর খান ও মেজর (পরে কর্নেল) হারুনকে বলেছিলাম। আওয়াজটা ঠিক বুঝতে পারিনি। আমার বন্ধু গুজরাটের হাবিলদার শের খান কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিল শেখ সাহেব খুব চালাক লোক, নিজে না বলে অপারেটরকে দিয়ে বলিয়েছে। তবু তার বিচার হবে, ঐ রেকর্ড তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হবে।

মনে হচ্ছে আমাদের রেকর্ড করা টেপই তুই শুনেছিস।

ওটা বিস্তারিত লিখে দিও তো। তবে তো অয়্যারলেস সেটটা ওরা নিয়ে গেছে।

স্যার, শের খান আরো বলেছিল অপারেটরকে ওরা গুলি করে মেরেছে।

হ্যাঁ তাই হবে। ওকে আর এখানে পাওয়া পায়নি। আমি অনেক খুঁজেছি।

তখন আমার কয়েকজন পাঞ্জাবি সাথী বলদা গার্ডেন কি, কোথায় এসব জানতে চেয়েছিল।

হ্যাঁ, স্বাধীনতার ঘোষণা বলদা গার্ডেন, ইপিআর সিগন্যাল সেন্টার, পার্বত্য চট্টগ্রাম, মগবাজার অয়্যারলেস সেন্টার থেকে প্রচার করার চেষ্টা করেছিলাম। আর্মি

অ্যাকশনের জন্য এখানের লোকজন ঘোষণা বার্তাটি শুনতে পায়নি। তবে বিদেশিরা তাদের হাই পাওয়ার সেটে শুনেছে। তারা আমেরিকা, ভারত সরকারকে সে রাতেই জানিয়েছে ।

স্যার, আপনি শুনেছিলেন ?

না। তবে বঙ্গবন্ধু নিশ্চিত হয়েছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদেশিদের স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিবার জন্য আহবান বার্তা দিয়েছিলেন।

স্যার, আমি লায়ালপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকা অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর রমনা মাঠে একটা জনসভায় বলতে শুনেছি, তিনি মগবাজার অয়্যারলেস কেন্দ্রে স্বাধীনতার ঘোষণা বার্তা ফোনে বলে দিয়েছিলেন ।

ওটা স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচারের পরপরই স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি ও সাহায্যের জন্য তিনি আবেদন করেন। লোকে ইহাকে স্বাধীনতার ঘোষণা বলে ভুল করেন। ওখানেই সমস্যা । আর একটা কথা, তোরা ৭-মার্চের ভাষণকে স্বাধীনতার ডাক বলছো – আমি বলি, ওটা ছিল বঙ্গবন্ধুর অনানুষ্ঠানিক বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা। ঐ ভাষণে শুধু একটি মাত্র কথা বাকি ছিল, যা বঙ্গবন্ধু ২৫শে মার্চ ৭১ (রাতে) বলেছিলেন – তা হল **"আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন"**। বাঙালি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ উক্তি।

স্যার রাওয়ালপিন্ডিতে আমরা মুজিবনগর ডিকলারেশনের একটা লিফলেট লন্ডন থেকে মে মাসে পেয়েছিলাম। ঐ লিফলেটে যতদূর মনে পড়ে, ৩টা বিষয় ছিল:

(১) The Proclamation of Independence (of Bangladesh), মুজিবনগর, ১০ এপ্রিল ১৯৭১;

(২) Laws Continuance Order, 10 April 1971; এবং

(৩) প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের বেতার ভাষণ।

ওই লিফলেটটা রাওয়ালপিন্ডি, ইসলামাবাদ, চাকলালার বহু বাঙালি দেখেছে। পাকিস্তানের যোগাযোগ সচিবকে (বাঙালি) আমি নিজে দিয়ে এসেছিলাম। তিনি লিফলেটটা চুমো দিয়ে চোখ মুছেছিলেন। আমার মাথায় হাত রেখে আদর করেছিলেন।

হ্যাঁ সেটা ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য সারা বিশ্বে লিফলেট আকারে প্রচার করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, জিয়ার বেতার ঘোষণাও আমরা মুজিবনগর থেকে বার বার প্রচার করেছি দেশের ভিতরে বাইরে, মুক্তিবাহিনী ও জনগণকে উৎসাহিত করার জন্য। তার ঘোষণাকে ওয়্যার কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল।

স্যার, এখন গ্রাম-গঞ্জে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হচ্ছে পাকিস্তানই ভালো ছিল। দেশ স্বাধীন হয়ে কি লাভ হলো। সারা দেশে অরাজকতা। মুন্সি-মৌলবিরাও প্রকাশ্যেই বলছে, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশকে সিকিম বানাবে। ভারতের সঙ্গে মিলবে। অফিসে, লাইনে এমনকি খেতে বসেও এ-সব আলাপ আলোচনা হচ্ছে। ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে পাক ফেরত লোকেরা।

ওদের বুঝাতে হবে। আরব-ইসরাইল যুদ্ধের ফলে সারা বিশ্বে একটা ব্যাপক ওলট পালট হয়ে গেছে। তেলের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সব জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু বাংলাদেশে নয় সব দেশের অবস্থা এক। দেশ স্বাধীন হয়েছে ধীরে ধীরে অনেক কিছু হবে যা হাজার বছরে হয়নি। বাংলাদেশই থাকবে। ভারতের সঙ্গে কখনো মিলাবে না বরং সময়ে পশ্চিমবঙ্গ-ত্রিপুরা-আসাম বাংলাদেশের সঙ্গে মিলে যাবে। আওয়ামী লীগ, বঙ্গবন্ধু না হলে দেশ স্বাধীন হতো না।

স্যার, সর্বহারা ও জেএসডির নানা ধরনের লিফলেট, ব্যারাকে, লাইনে, বাথরুমে রাতে কে বা কারা ফেলে রাখে। এ-গুলি অফিসে জমা দিয়ে কোনো কাজ হচ্ছে না। মনে হচ্ছে একটা ষড়যন্ত্র চলছে। কর্তারা জানে।

তার মানে তোমাদের আশপাশেই ওরা আছে যারা লিফলেট ছড়াচ্ছে।

মনে হচ্ছে। আমি ধরতে পারলে সরাসরি সিজিএসকে বলে দিব। একটা লিফলেট মাননীয় মন্ত্রী ড. মফিজ চৌধুরীকে দিয়েছিলাম, বঙ্গবন্ধুকে জানাবার জন্য। উনি তখনই ফোন করলেন। ঠিক কাকে বললেন বুঝতে পারলাম না। বললেন সত্ত্বর ব্যবস্থা হবে। কিন্তু কোনো কিছু হয়নি।

দেখি কি করতে পারি ।

আমার সন্দেহ হয় স্যার। কর্নেল জিয়া পালিয়ে সর্বহারাদের সাথে যোগ দিয়েছেন। আর্মি, পুলিশ কেউই তাকে ধরতে পারছে না। ডেপুটি চিফ সাহেব নাকি জানেন।

ওসবে বিশ্বাস করো না। তাকে ধরার জন্যে সব রকমের চেষ্টা হচ্ছে।

স্যার, জামাল এখন এমও পরিদপ্তরে। ওর বিশ্বাস, সেনা সদরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কর্নেল জিয়ার যোগাযোগ রয়েছে।

তুমি চিন্তায় ফেললে ।

কতজনে কত কি যে বলছে। বিশ্বাস হতে চায় না। কিন্তু বাস্তব অবস্থাও তেমন মনে হচ্ছে। সিদ্দিক বলছে, বঙ্গবন্ধুকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে। ওরা নাকি চর।

সিদ্দিক তেমন মনে করছে কেন ?

ওর মতে মুজিবনগর সরকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তথা প্রতিরক্ষার TO&E অন্তত দশ বছর চালু রাখতে হতো। তারপর নতুন অবকাঠামো তৈরি করতে হতো। TO&E না হওয়ায় ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে না। পাকিস্তান ফেরত সৈনিকদের মধ্যে অরাজকতার সৃষ্টি হচ্ছে। এতোদিন আর্মি ছিল না, এখন আর্মির জনবল আসার পরও তা কাজে লাগান হচ্ছে না। পাকিস্তান থেকে আর্মি আসার আগেই তো এটা ঠিক করা উচিত ছিল।

আমিও তার চেষ্টা করেছিলাম। সরকারের কিছু সমস্যা ছিল।

সে যাই হোক, সাময়িকভাবে হলেও তা চালু করতে হতো। হাজার হাজার সৈনিক মাসের পর মাস শরণার্থীর মতো ক্যাম্পে থাকবে এটা ঠিক নয়। যেন ইচ্ছা করেই এমন করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুকে TO & E অনুমোদন দিতে বলুন।

ইচ্ছা করে ?

হ্যাঁ স্যার। নইলে এভাবে কোনো দেশের সৈন্যদের বসিয়ে রাখে ? সিদ্দিক বলছে, ডিফেন্স রি-অর্গানাইজিং কমিটিতেই ভেজাল আছে।

কি ভেজাল?

ঘোলা পানিতে মাছ ধরা। বঙ্গবন্ধুকে বলুন, বেশি বিলম্বে হলে ভয়ানক সমস্যা হবে।

ডিফেন্স অবকাঠামো আমিও চাই তাড়াতাড়ি চালু হোক।

স্যার, একটা বিষয়। অনেক মুক্তিযোদ্ধা যারা পূর্বাঞ্চলীয় রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছে, তারা মুজিবনগর সরকারকে মানতে চায় না।

না মানার কারণ নেই। সব মুক্তিযোদ্ধাকে মুজিবনগর সরকারের নামে শপথ নিতে হয়েছে। তাছাড়া ওরা যুদ্ধ করলো কিভাবে, তাদের থাকা-খাওয়া, অস্ত্র-শস্ত্র সবই তো মুজিবনগর সরকার তথা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সরবরাহ করেছে। আমার কমান্ডে যুদ্ধ করেছে। যারা মুজিবনগর সরকারকে স্বীকার করে না তারা মূলত স্বাধীনতার শত্রু। ওরা বাংলাদেশের মঙ্গল চায় না।

আর একটা অনুরোধ স্যার, পাক ফেরত সৈনিকদের তাড়াতাড়ি কাজে লাগান হোক, নইলে এরা সরকারের অনিষ্ট করবে, জামাতীদের খপ্পরে পড়বে।

TO&E অনুমোদনের সঙ্গে সঙ্গে সব ঠিক হয়ে যাবে। সাময়িকভাবে কতিপয় ইউনিট দাঁড় করাবার ব্যবস্থা করছি, ওদের নিয়ে বেশি ভেবো না।

ভাববো না, অনেকেই তো পাকিস্তানে ফিরে যেতে যায়। দেশে এসে ভুল করেছে বলে দুঃখ করছে ।

বলো কি ?

জি স্যার। সেদিন খালেদ স্যারকে (CGS) বললাম, উনি রাগ করলেন। আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। স্যার, সরকার বিরোধী একটি শক্তিশালী দল কাজ করছে। তারা এমআই, ডিএফআই সংগঠনে কাজ করছে। স্যার ভালো করে, সময় করে বিষয়গুলি পর্যালোচনা করুন, বঙ্গবন্ধুকে বলুন।

সিদ্দিককে একবার আসতে বলিস তো ?

ও আসতে পারবে না স্যার। TO&E নিয়ে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকে ।

ঠিক আছে বঙ্গবন্ধুকে অবগত করার চেষ্টা করবো।

স্যার, আর একটা বিষয় আমাকে খুব কষ্ট দেয়। পিন্ডিতে আমি জিয়ার বিদ্রোহের কথা বিবিসি, ভোয়া, আকাশবাণী থেকে শুনেছি। মিলিটারি অপারেশনস পরিদপ্তরের আফজালকে তো আপনি চিনেন, সে আমাকে বলেছিল, জিয়া ভি স্বাধীনতা মাঙ্গতা হ্যায়, জিয়া ভি প্রেসিডেন্ট বনগায়ে, ও আব তোমহারা মুজিবকো মানতা নেহী। তুম শালালোক সব বেইমান।

দেখ তখন জিয়া যা বলেছে, বাঙালি স্পিরিটেই বলেছে, তবে যুদ্ধ কৌশলের জন্য কিছু কিছু কথা বলেছে যা তখনই চট্টগ্রাম সংগ্রাম পরিষদ সংশোধন করে দিয়েছে।

খারাপ কিছু বলেনি। তখনকার ঘোলাটে অবস্থায় যা বলেছে সেটাই কাজে লেগেছে। আমরা মুজিবনগর থেকে যুদ্ধ কৌশল হিসেবে সে-সব ঘোষণার অংশ বিশেষ প্রচার করেছি– লোকজনকে উৎসাহিত করতে, পাক বাহিনীকে বিব্রত করতে।

কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে সরকার তার সঠিক মূল্যায়ন করছে না।

সরকার তার জন্য অনেক কিছু করেছে। তাকে উপ-সেনা প্রধান করা হয়েছে, এ কম কিসে ? তোমার সৈয়দ দাদার[১৫] কথা বলো, নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছেন ।

জি স্যার। তবে তার তো অনেক আকাঙ্ক্ষা। গতমাসে ড. ইব্রাহিম সাহেবের বাড়ি ছিলেন। উনি তাকে চেকআপ করেছেন। ইব্রাহিম সাহেব আগের মতো নেই সে জন্যে দুঃখ করেছেন ।

ওসমানী সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, তাঁকে আমার কাছে আনবে না ?

উনি এখন কারো কাছে যান না স্যার ।

তো সৈয়দ সাহেব কি চান ?

পশ্চিমবঙ্গ, মানভূম, বীরভুম, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, কাছার, করিমগঞ্জ, ত্রিপুরা, মিলে মহাবঙ্গ। যার জন্য তারা এক সময় কাজ করেছিলেন।

৬০ থেকে ১০০ বছরেও তা আর হবে না। একাত্তরে একটা সুযোগ এসেছিল আমরা তার সুযোগ নিতে পারিনি ।

ততক্ষণে অনেক লোক এসেছেন। তাঁর ইঙ্গিতে আমি চলে এলাম। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়েছেন। ঘোষিত স্বাধীনতাকে রক্ষার জন্য মেজর জিয়া পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য বেতারে ঘোষণা দিয়েছেন ওসমানীর নিকট জানতে পেরে হালকা বোধ করলাম।

জুলাই মাস বঙ্গবন্ধু ওসমানীসহ কয়েকজনকে মন্ত্রী পরিষদ থেকে বাদ দিলেন । আমরা যারা ওসমানীকে পাকিস্তান আমল থেকে জানতাম, খুব দুঃখ পেলাম। আমাদের বিশ্বাস হচ্ছিল না। নানাজনের নানা মত ব্যক্ত করতে লাগলেন। সিদ্দিক বললো, ওসমানীকে বাদ দেওয়া ঠিক হয়নি। এজন্য বঙ্গবন্ধুকে অনেক খেসারত দিতে হবে। কয়েকদিনে সেনানিবাসে এমন কোনো সৈনিককে পেলাম না যে তার জন্য দুঃখ করল না। সবার ধারণা বঙ্গবন্ধু ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন ।

নভেম্বর
১৯৭৪

জুন মাসে ভুট্টো বাংলাদেশ সফরে এলে তাকে যেভাবে বাঙালিরা অভ্যর্থনা জানায় তা দেখে মনে হলো একাত্তরে তিনি বাঙালিদের তেমন ক্ষতি করেন নি? জামাত, মুসলিম লীগ প্রমুখ পাকিস্তানি সমর্থক কর্মী/নেতাদের তিনি যেভাবে টাকা পয়সা দিয়ে পুরস্কৃত করলেন, সেটাও খুব চিন্তার কারণ। বঙ্গবন্ধু কেন যে ভুট্টোকে আসতে দিলেন, সে জন্য আমরা খুব আতঙ্কিত হলাম। তার উলটা পালটা কথাবার্তাও ভালো লাগছিল না। বন্ধুরা বিশেষ করে মেজর জামাল, মেজর সিদ্দিক, সুবেদার মান্নান আকন্দ ভুট্টোর

ভিজিটকে ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করল। তারপর আমেরিকান পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিঞ্জার ঢাকা আসলে আমরা খুব শঙ্কিত হলাম। ইহুদি এ লোকটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোর বিরোধী। কিসিঞ্জার ঢাকা থেকে চলে যাবার দু-দিন পর বন্ধু সুবেদার আবদুস সোবহান জানাল যে জেনারেল জিয়া খুব গোপনে কিসিঞ্জারের সঙ্গে দেখা করেছেন। আমি বঙ্গবীরের বাড়ি গেলাম। তাঁকে খুব গম্ভীর মনে হলো। বললাম, স্যার বলেছিলাম না, ভুট্টো আসলেই একটা অঘটন হবে। সব মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রিদের বাদ দিয়ে বঙ্গবন্ধু এখন রাজাকারদের মন্ত্রী বানাবেন। এদিকে সেনানিবাসে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা গঠিত হয়েছে। আমাকে অফার দেওয়া হয়েছে। হয়ত আপনাকেও আমন্ত্রণ জানাবে।

আর কি করবে বলে তোর মনে হয় ?

আমার মনে হচ্ছে, বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে গেলে গোলাম আজমেরা তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করবেন। ভুট্টো তার গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর দয়ার শরীর তাকে মাফ করে দিবেন এবং ঐ সব পাপীদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিবেন ।

না এমন হবার কোনো সম্ভাবনা নেই ?

স্যার, আমরা কোহাট দুর্গে ছিলাম, তখন বিবিসির খবরে শুনেছিলাম বাংলাদেশের অবকাঠামোতে প্রধান সেনাপতি হবেন লে.জে. ওয়াসিউদ্দিন। দেশে ফিরলেই তিনি প্রধান সেনাপতি হবেন এবং সে-জন্যই আপনি পদত্যাগ করেছেন।

হ্যাঁ এমনই সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক চক্রান্তে পাকিস্তান থেকে আমার সৈন্যদের ফিরাতে অনেক বিলম্ব ঘটে। তাছাড়া আমি যেহেতু সংসদ সদস্য ছিলাম, ক্যাবিনেটে যোগ দিতে হলো তাই ও পদ ছেড়েছিলাম।

আমি পিএসও কনফারেন্সের ফাইলে দেখেছি, পাক ফেরত সিনিয়র অফিসারদের বাংলাদেশ বাহিনীতে নিয়োগের বিরোধিতা করেছেন একজন জেনারেল। কিন্তু তার ড্রাইভার আমাকে একটা চমৎকার খবর দিয়েছেন। তিনি প্রায় দিন টেনিস খেলে সেখান থেকে সোজা পরিবাগ ওয়াসিউদ্দিনের বাসায় যেতেন এবং কতক্ষণ আলাপ করে ফিরতেন ।

তাই নাকি ?

জি স্যার। দুটোই সত্য। পিএস পরিদপ্তরে ফাইল রয়েছে, আর ড্রাইভারও রয়েছে, যদি বলেন তাকে একদিন আপনার কাছে আনতে পারি। জেনারেলের ড্রাইভার বিষয়টি ভালো মনে করেনি যদিও সে একজন সিপাহি। ওয়াসি রাষ্ট্রদূত হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি প্রায়দিন তার কাছে যেতেন।

হ্যাঁ। আমরা তা জানি ।

কিন্তু তাঁর প্রধান সেনাপতি নিয়োগে তো তিনিই সরাসরি বাধা দিয়েছেন, তাও তো ঠিক ।

ওসমানী চুপ করে রইলেন ।

স্যার আমার চাচা[১৬] ইন্সপেক্টর আবদুল আজিজ গণভবন তথা বঙ্গবন্ধুর বাস ভবনের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত। তিনি সেদিন জিজ্ঞেস করলেন, সেনাবাহিনীতে

জিয়ার সমর্থক কেমন ? আমি তার জবাব দিতে পারিনি, তবে বলেছি, তাঁর সেক্টরে যারা যুদ্ধ করেছেন, তাদের ধারণা তারাই শুধু যুদ্ধ করেছেন এবং ঐ জেনারেলই স্বাধীনতার মূল নিয়ন্ত্রক ছিলেন। অথচ এ ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল।

দেখ, সে ছিল পাকিস্তানের গোয়েন্দা --- উচ্চতর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। আয়ুব খান তাকে বাঙালিদের বিরুদ্ধে এক্সপ্লোয়েট করেছে। তার ভুরি ভুরি খবর আমি জানি। আয়ুবের মতো তারও ক্ষমতার লোভ অনেক। মুক্তিযুদ্ধের সময় বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। তাকে আমি পানিশমেন্টও দিয়েছি। তখনকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ডিসমিস করতে পারিনি।

তবে যুদ্ধে তার অবদান আছে। এতে কোনো সংশয় নেই।

কিন্তু স্যার জামাল মনে করে মুক্তিযুদ্ধে জিয়া পাকিস্তানের অ্যাজেন্ট ছিলেন। আইএসআই-এর নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করেছেন। সোবহান বলে, তার কাজ ছিল কমান্ড ভেঙে দেওয়া, মুক্তিযুদ্ধকে বাধাগ্রস্ত করা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বকে হেয় করা। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। আওয়ামী লীগকে বিতর্কিত করা। দেশবাসীকে বিভ্রান্ত এবং বহির্বিশ্বকে অবিশ্বাস করা। আর সিদ্দিকও সব সময় বলছে, জিয়া কখনোই স্বাধীনতা চাননি। সে জন্যই ২৬শে মার্চ '৭১ জনাব হান্নানের স্বাধীনতা ঘোষণা শুনেও এবং চট্টগ্রাম সংগ্রাম পরিষদ থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা বাণীর লিফলেট পাওয়ার পরও আবার নিজের পক্ষ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা দেন, নিজেকে সেনাপ্রধান ও রাষ্ট্র প্রধান ঘোষণা করেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদের প্রতি তার কোনো আস্থা ছিল না। অথচ তখন সংগ্রাম পরিষদের অনুমোদন ছাড়া কিছু করা স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপন্থী ছিল। এ কথা লোকজন এখন ভুলে গেছেন। ওসমানী চুপ রইলেন ।

স্যার, আমার ক-জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলেছেন, বিজয়-উত্তর তিনি প্রধান সেনাপতির জন্য খুব লবিং করেছিলেন।

হ্যাঁ, সত্য। আমি তাকে ক্ষমতাবলয়ের দূরে রাখার জন্যই কুমিল্লা ব্রিগেড কমান্ডার নিয়োগ করেছিলাম।

কিন্তু কুমিল্লাতেই তিনি এবং মেজর তাহের মিলে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন। তা প্রকাশ পেলে তারই পরামর্শে বঙ্গবন্ধু তাহেরকে চাকরিচ্যুত করেন। তার গায়ে আঁচড়ও লাগেনি ।

এসব ঘটনা অনেক ঘটেছে। আমার কথা তো বঙ্গবন্ধু শোনেন নি। তিনিই উপসেনাপ্রধান পদ সৃষ্টি করে তাকে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে আনেন। এখন তিনি তাকেই বেশি গুরুত্ব দেন। এর পরিণতি ভয়াবহ হতে বাধ্য। একদিন টের পাবেন।

আপনাদের মন্ত্রী পরিষদ থেকে বের করে দিবার পিছনে কি এ জেনারেলের ভূমিকা ছিল বলে মনে করেন ।

থাকতে পারে ।

আপনি সব কথা বুঝিয়ে বঙ্গবন্ধুকে বলেন না কেন ?

এখন তিনি জাতির পিতা, সরকার প্রধান ইত্যাদি। তাঁর সঙ্গে এমন সব বিষয়ে আলাপ করার সুযোগ নেই। তুই বলতে পারিস না ?

না। আমার চাচার মাধ্যমে দু-বার চেষ্টা করেছি। উনি তো সময় পান না। সাহস পান না ।

তোর চাচাকে বললেই পারিস।

চাচা এসব বিষয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে চান না। অথচ আমার কাছে খুব খারাপ লাগছে। ভয়াবহ মনে হচ্ছে।

সব দিক দিয়েই সমস্যা বাড়ছে। প্রকৃতিও আমাদের বিরুদ্ধে।

স্যার, একটা ব্যাপারে খুব ভাবনা হচ্ছে।

কি বিষয়?

পাকিস্তান ফেরত অফিসারবৃন্দ বোধ হয় বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে যাচ্ছেন। তারা নাকি জেএসডির দলে ভিড়ছে।

কারণ কি?

শুনেছি আর্মি থাকবে না। পাক ফেরত অফিসারদের অবসরে পাঠাবে। তবে তারা রক্ষী বাহিনীতে যোগ দান করতে পারবে।

ও সব বাজে কথা।

বাজে কথা নয় স্যার। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকরাই বলছেন বঙ্গবন্ধু আর্মি ভেঙে দিয়ে শুধু মাত্র রক্ষীবাহিনী রাখবেন।

বললাম ত ওসব বাজে কথা।

ফিরে এলাম। কিন্তু সেনানিবাসের সবখানেই ঐ আলোচনা হতে দেখলাম। তাই মনে বড়ো আশঙ্কা করতে লাগল।

জুন
১৯৭৫

১৭ জুন ১৯৭৫। সিএমএইচ থেকে ফিরছি স্টাফ রোডের মোড়ে (পুলিশ ফাঁড়ির সামনে) এমপি হালিদার শরাফতের সঙ্গে দেখা। তিনি জানালেন যে, গভীর রাতে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত অতি গোপনে সেনানিবাসে প্রবেশ করছে। বিষয়টি গুরুতর এবং বিপজ্জনক। মনে হচ্ছে আর একটি ১৯৫৮ হতে যাচ্ছে।

কদিন আগে বন্ধু নায়েব সুবেদার আবু তাহের (মিলিটারি পুলিশ) একই কথা বলেছিলেন। খুব চিন্তায় পড়লাম। কি করবো। কাকে বলবো সাহস পাই না। বারবার শুধু একটা কথাই মনে জাগে। বঙ্গবন্ধু বাকশাল কেন করলেন? তাঁর এই একটি ভুলই ত দেশের সর্বনাশ করবে। যতই ভাবি, বুকটা চিন চিন করে। সরকার বিরোধী আলোচনা সর্বত্র। সরকারি দলের নেতা-কর্মিদের সীমাহীন দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ঘুষ, চোরাকারবার, খুন, রাহাজানি, মজুতদারি। স্বাধীন দেশে প্রকাশ্যে নিত্যসামগ্রীর দাম বাড়ছে, কোনো প্রতিকার, প্রতিবাদ করার কেউ নেই। শুনবারও নেই। অসহায় অসহনীয় জনজীবন ।

একদিকে জেএসডির চোরা গুপ্তা, অনিয়ম, অন্যদিকে সরকারি প্রশাসনিক ব্যর্থতা জনজীবন অতিষ্ঠ।

একাত্তরে আমরা যারা রাওয়ালপিন্ডি-ইসলামাবাদ (GHQ, ISLAMABAD) ছিলাম। নিজেদের মধ্যে অনেক আলাপ আলোচনা করলাম। বিষয়টি জটিল থেকে জটিলতর মনে হলো। একজন রাষ্ট্রদূত গোপনে কি করে সেনানিবাসে গভীর রাতে প্রবেশ করে। কি জন্যে কার কাছে কোথায় যায়- এসব প্রশ্নে আমরা অস্থির।

এদিকে অনেক মুক্তিযোদ্ধা বিশেষ করে যারা পূর্বাঞ্চলে (কুমিল্লা কেন্দ্রিক) জিয়ার অধীনে যুদ্ধ করেছেন, তাদের বলাবলি করতে শুনি - "যুদ্ধ করলাম আমরা, আর আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মিরা ক্ষমতায় বসে আকাম-কুকাম করবে ?"

শেখ মুজিব কি জানে ? (এরা বঙ্গবন্ধু বলে না) তিনি ত দেশে ছিলেন না। মুক্তিযুদ্ধ দেখেন নি ইত্যাদি। পরে সুবেদার মান্নান আকন্দ বললেন, দেশে সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটবে। বিষয়টি বঙ্গবন্ধুকে জানান দরকার। ল' কলেজ থেকে ফেরার পথে ড. মফিজ চৌধুরীর বাড়ি গেলাম। তাঁকে বললাম। তিনি চিন্তিত মনে বললেন: "আমেরিকা আমাদের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল। তারা যে কোনো মূল্যে তার প্রতিশোধ নিবে। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে এখন আমার অনেক মত পার্থক্য। এসব বিষয় আলাপ করাও বিপদ। তবুও চেষ্টা করব।"

ছুটির দিনে আমি বঙ্গবীরের বাসায় গেলাম। তাঁকে হাসি-খুশি মনে হলো। বললেন- নতুন সমস্যা ।

বললাম। স্যার পতিত জমিতে আবাদ করার জন্য বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে কাজ হচ্ছে। কিন্তু এ কাজের সমালোচনা করেছেন জেনারেল জিয়া। কনফারেন্সে বলেছেন, এসব সৈনিকের কাম নয়। আর তা সারাদেশে সৈনিকদের মধ্যে সাড়া দিয়েছে। ছেলেরা খুব খুশি। রাতারাতি জিয়া ভক্ত হচ্ছে।

ইউনিটে এখন তো তেমন কাজ নেই। ফসল ফলালে ক্ষতি কি? পাকিস্তানে ইউনিটে অনেক আবাদ হতো। সৈন্যরা তো করতো না ? করতো। আমি নিজেও তো সৈনিক হিসেবে অনেক ফটিক করেছি।

তুমি জিয়ার ড্রাইভারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখো তো ?

স্যার, একটা কথা বলি ?

বলো ।

বনানি চেক পোস্ট দিয়ে গভীর রাতে মাঝে মাঝে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত সেনানিবাসে ঢোকেন।

বলো কি ?

হ্যাঁ। চেক পোস্টে তাঁর গাড়ি থামানো হয় না এমপি (মিলিটারি পুলিশ) ওসির নির্দেশে।

তুই জানলি কি করে ?

কাজটি যে ভালো না, তা এমপির লোকেরা বোঝে কিন্তু কিছু করতে পারে না। নৈশ ডিউটি করা এমপিরা বলেছে। তারাও মানুষ, ভেড়া না।

ওরা তোর বন্ধু নাকি ?

ঠিক বন্ধু না, তবে ওরা রাওয়ালপিন্ডি, কুমিল্লা ছিল। আমি সিজিএস (চিফ অফ দ্য জেনারেল স্টাফ)কে বলার চেষ্টা করেছি, পারিনি। উনি একদম বদলে গেছেন। কথা বলতে চান না। অথচ পাক আমলে কেমন ছিলেন। খালেদ স্যার আমার সঙ্গে কথা বলতে চান না - আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

তুই সাবধানে থাকবি। এসব জটিল বিষয় নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবি না। কিন্তু বনানির রাস্তাটা রাতে বন্ধ থাকে। গভীর রাতে একজন রাষ্ট্রদূত গোপনে সেনানিবাসে কার কাছে যায়, এটাতো জানা দরকার। আপনি বঙ্গবন্ধুকে বলুন।

চেষ্টা করবো, তবে তোর কথা বিশ্বাস হচ্ছে না।

তাহলে ওদেরকে আপনার কাছে পাঠাবো ? মিলিটারি পুলিশদের মুখে শুনুন।

তার দরকার নেই। দেখি কি করা যায় ? এ কি করে সম্ভব ? এ হতে পারে না।

সবই সম্ভব স্যার। মনে হচ্ছে আগরতলার মতো একট ষড়যন্ত্র হচ্ছে।

তুই ওদের কাছ থেকে যে অফিসার ফোন করে তার নাম আমাকে জানাবি।

আমি ঐ অফিসারের (অর্থাৎ OC Dett MP গাজীপুর) নাম জানলেও বললাম না। তাকে কাগজ দিলাম। বললাম একাত্তরের ২৬-২৯ মার্চ GHQ তে কি দেখেছি। জানাতে বলেছিলেন। আগেও একবার লিখে দিয়ে গেছি। মনে হচ্ছে আপনার গার্ডরা বিশ্বস্ত ছিল না।

তুই পড়ে শোনা।

সময় লাগবে স্যার।

অসুবিধা নেই। পড়।

আমি পড়ে শুনালেম। কাগজটি দিলাম (পরিশিষ্ট-১ দেখুন)। স্যার, আমি ড. মফিজ চৌধুরীকে বলেছিলাম, ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ ছিল বাঙালির জন্য বড়ো সর্বনাশ। উনি আমার সঙ্গে একমত পোষণ করেছিলেন। এ বিষয়ে আপনার মত জানতে বড়ো ইচ্ছা করে।

হ্যাঁ দেশ ভাগ ছিল বাংলা ও বাঙালির চরম সর্বনাশ। দেশ ভাগ না হলে বাঙালি হতো ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতি এবং বাঙলা হতো ভারতের সবচে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র। বাঙলা ভাষা হতো ভারতের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। মাদ্রাজ-বোম্বাই-দিল্লির চেয়ে ঢাকা-কলকাতা-আগরতলা হতো বেশি গুরুত্বপূর্ণ শহর। কলকাতা-মঙ্গলা-চট্টগ্রাম বন্দর হতো সিঙ্গাপুরের চেয়েও গুরুত্ববহ বন্দর। অধিকাংশ সময়ই বাঙালিরাই দিল্লির প্রধানমন্ত্রী হতেন।

জুলাই-নভেম্বর
১৯৭৫

ওসমানীকে মন্ত্রী পরিষদ থেকে বাদ দিবার আর বিশেষ করে আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের সেনানিবাসে দিনরাত ঘোরাফেরার বিষয়টি স্পষ্ট হবার পর বন্ধু সুবেদার

আবদুস সোবহান বঙ্গবীরের নিকট যাবার জন্য খুব তাগিদ দিতে লাগল। ওকে ইউডিসি সিরাজের (ওসমানীর সাবেক ব্যাটম্যান) সঙ্গে যাবার বললে সে রাগ করে, 'না আমি তোর সঙ্গেই যাবো।' আমরা সবাই বঙ্গবীরের বাসায় যাবো বলে ঠিক করলাম। আমেরিকান রাষ্ট্রদূত গোপনে রাতে সেনানিবাস প্রবেশ করাতে আমরা তখন ধরেই নিয়েছিলাম যে, সেনাসদরের উর্ধ্বতন সবাই সরকার উৎখাতে সচেষ্ট এবং ওসমানীকেও আমার তখন সন্দেহ হয়েছিল। আমি, জামাল, মান্নান আকন্দ এ নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি। বেনামে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির ঠিকানায় পত্র দিয়েছি। ইতোমধ্যে সরকারের কতিপয় কার্যব্যবস্থা সারা দেশজুড়ে সরকার বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। বাকশাল গঠনে আমরা হতবাক হলাম। আমার মেঝ মামা একদিন খুব আক্ষেপ করে বললেন, শেখের কপাল খারাপ। তাই এসব হচ্ছে। তাকে বুঝাবার মতো লোক নেই। সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ। কেউ কেউ বলছে, শেখকে ধরে এনে সেনানিবাসে রাখতে হবে। কারণ তার চারপাশে যারা আছে তারা দেশের আসল অবস্থা তাঁকে জানতে দিচ্ছে না। ৩ কি ৪ আগস্ট একটা জরুরি চিঠি সই করাতে গেলাম। সেনাসদর কনফারেন্স রুমের বারান্দায় জেনারেল জিয়া বসা। তাঁর পাশে সামরিক সচিব কর্নেল নাসিম। স্যান্ড মডেলের পাশে অনেক অফিসার। নাসিম সাহেব (পরে সেনাপ্রধান) চিঠিগুলি সই করছেন। এ-সময় ব্রিগেডিয়ার শওকত সাহেব জিয়ার সঙ্গে আলাপরত ছিলেন। শওকত স্যার বললেন, How long this drama will continue sir. I will not come after this. জেনারেল জিয়া গম্ভীরভাবে বললেন, Wait Shawkat. সিজিএস খালেদ স্যার বারান্দার নিচে বসা ছিলেন, আমার প্রতি বার বার দেখছিলেন কিন্তু এতোসব সিনিয়র অফিসারের সামনে আমার খুব অস্বস্তি লাগছিল। বিকালে সিদ্দিকের সঙ্গে আলাপ করলাম।

ড্রামাটা কি ?

সিদ্দিক বললো, শেখের কপাল খারাপ। এরা যা চায় তা মানলে তার কি ক্ষতি ? আর্মির অবকাঠামো (TO&E) আজ যদি না মানে তাহলে কি যে অঘটন ঘটবে খোদায় জানে। একদিকে সেনাপ্রধান আর একদিকে উপ-সেনাপ্রধান। শফিউল্লাহ চাচ্ছেন তাড়াতাড়ি TO&E কার্যকর করতে। জিয়া চান আস্তে আস্তে। দেশের আর্থিক অবস্থায় ব্রিগেড লেবেলে রাখতে। CAS চাচ্ছেন ডিভিশন। বললাম, আজ কোনোটি পাশ হলো? ও বললো, ডিভিশন । কিন্তু শেখ মানবে না। জিয়া যা বলেন উনি এখন সেটাই মানেন। দেখিস যে কোনো একটা অছিলায় আজো বঙ্গবন্ধু ফিরিয়ে দিবেন। মুক্তিরা এখন জিয়ার পিছনে লাইন দিয়েছে। যেটা কনফারেন্সে পাশ হয়েছে, সেটা মানলেই হয়।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করলাম। রাত একটায় সিদ্দিক মেসে ফিরলো। হতাশার সুরে জানাল, যা ভাবছিলাম তাই হয়েছে। ৮-তারিখে আবার বসবেন --- কিছু সংশোধন করতে হবে। একটা কি দু-টো ডিভিশন শীঘ্রই খাড়া করা হবে। সমস্যা ডিভিশন কোথায় হবে ঢাকা না যশোরে। ও কি যে ঝামেলা। ডিভিশন

হলে জিওসি কে হবেন ? পিএসও-দের র‍্যাংক কি হবে ? ইত্যাদি। সমস্যার পর সমস্যা।

৬ আগস্ট বিকালে সোবহানসহ বঙ্গবীরের বাসায় গেলাম। আধা ঘন্টা পর ডাক পড়লো। বললাম এই সোবহান ---- । ৫৮ সালের পর সোবহানকে দেখলেন তিনি এবং ঠিকই চিনলেন। বললেন, তুমি ট্রানজিট থেকে ওর সঙ্গে যেতে। পিন্ডিতে অনেক ট্যাংক দেখে ঢাকায় ১০টি ট্যাংক রাখার জন্য বলেছিলে।

স্যার তখন আমরা বুঝতাম না।

সে জন্যই তোমাদের আমার ভালো লাগত। দেশপ্রেম তোমাদের মধ্যে জাগ্রত ছিল। এখন কেমন লাগছে।

সোবহান কেঁদে ফেললো। বঙ্গবীর তার মাথায় হাত রেখে বললেন, রহমান তোমার কথা অনেক বলেছে ।

সোবহান বলে, স্যার আপনার কমান্ডে যুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমরা সে কি গর্ব অনুভব করি বুঝাতে পারবো না। স্যার ১৯৫৮ সালে আমরা জিএইচকিউ রাওয়ালপিন্ডি ছিলাম। তখন যে অবস্থা হয়েছিল, বর্তমানে ঠিক তেমনই। তখন আমরা জানতাম না, আয়ুব খান দেশে অঘটন ঘটাচ্ছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি কে কলকাটি নাড়াচ্ছে ?

কে ?

স্যার, যিনি গোপনে হেনরি কিসিঞ্জারের সঙ্গে দেখা করেন। যিনি ডিসমিস্যাল অফিসারদের নিয়ে গোপনে শলাপরামর্শ করেন তিনি। আইয়ুব খানের এক সময়ের চামচা, এনএসএফ এর জনক, আগরতলা মামলার সংগঠক ।

বঙ্গবীর মৃদু হেসে বললেন। সোবহান ভুলে যেও না তিনি বীরউত্তম। বর্তমানে উপ-সেনা প্রধান।

স্যার সে-জন্যইতো ভয় বেশি। ৫৮তে আয়ুব খান সেনাপ্রধান ছিলেন। তাই সঙ্গতই অঘটন ঘটান।

এসব আলোচনা কি বিপজ্জনক নয়?

তা জানি স্যার। কিন্তু আপনি আমাদের শেষ ভরসা। বঙ্গবন্ধুকে বলুন কিছু একটা করুন।

সোবহান, তাঁর ঘোষণায় মুক্তিযুদ্ধ শক্তিশালী হয়েছিল ।

স্যার, তাঁর ভাষণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল। পাঞ্জাবিরা আনন্দে উল্লসিত হয়েছিল। তাই তো ওরা আমাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল করতো। আব তেরা পিও কন? আর্মিরা মুজিবকে মানতা নেহী।

১০ আগস্ট ভোরে সেনাসদর গেটের কাছে এমপির ল্যান্স নায়েক আলী ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গেল। বললো, আজ রাত ৩-টায় আমেরিকান রাষ্ট্রদূত বনানি চেকপোস্ট দিয়ে সেনানিবাসে ঢুকেছে। গাড়িটি আর্টিলারি অফিসারস মেস পর্যন্ত যেতে সে দেখেছে। স্যার, আমার খুব ভয় হচ্ছে, দেশে একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। সে-দিন সন্ধ্যায় ওসমানী ও ড. মফিজ চৌধুরীর বাড়ি গিয়েছিলাম।

ওসমানী আমার কথা বিশ্বাস করেননি। বকা দিয়েছিলেন। ড. মফিজ চৌধুরী শুনে খুব বিচলিত হয়েছিলন। বঙ্গবন্ধুকে বিষয়টি জানাবেন বলেছিলেন।

২০০৭ সালে অক্টোবর মাসে সিএমএইচ, ঢাকা ল্যান্স নায়েক (অবসরপ্রাপ্ত হাবিলদার) আলী আমাকে দেখে খুব দুঃখ করে বলেছিল, কর্নেল স্যার বলেছেন আমি আর বাঁচবো না। কিন্তু দুঃখ রয়ে গেল, আপনারা কিছু করলেন না। আমরা বঙ্গবন্ধুকে হারালাম। তার বিচারের রায় দেখতে পেলাম না ....।

১৩ আগস্টও বোস্টার সাহেব গভীর রাতে সেনানিবাসে ঢুকেছেন তাও জেনেছি ১৪ আগস্ট সকালে কিন্তু ১৫ আগস্টের ঘটনার পূর্বে আর কাকেও কিছু জানাবার সুযোগ পাইনি। (আমার লেখা বই বাঙালি স্বাধীন কমান্ডার, পঁচাওরের পনেরই আগস্ট ও একাত্তরের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা-বই তিনটিতে এসব ঘটনার কিছু উল্লেখ করেছি)।

পাকিস্তান থেকে ফেরার পর কেন যেন মনে হচ্ছিল সরকার ওসমানীকে ও জেনারেল জিয়াকে ঠিকমত মূল্যায়ন করছে না। কথাটা ওসমানীকে আমি একবার বলেছিলাম। উনি হেসে বললেন, যার যা হক আল্লা তা পূরণ করেন। দেখ, আমি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান হয়েছি। বঙ্গবন্ধু সরকার আমাকে জেনারেল, মন্ত্রী করেছে। বঙ্গবন্ধু সহি-সালামতে দেশটা চালাক, ব্যাস, আর কিছু চাই না। ওসমানীর এ কথাগুলো আমার সব সময়ে মনে হতো। কিন্তু পঁচাত্তরের ঘটনাসমূহ আমার কাছে সব ওলট পালট করে দিল। আমি আমার নিজের হিসেব মিলাতে পারলাম না। আমি আমার নিকট হেরে গেলাম। সিদ্দিক বারবার বলে, পাকিস্তানে আমরা মার্শাল ল'-কে এতো ঘৃণা করলাম আর সেটাই কিনা আমাদের ঘাড়ে চাপল। সিদ্দিক ১৫ আগস্ট সকালে দৌড়ে বঙ্গবন্ধু ভবনে গিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর রক্ত রুমালে মেখে এনেছিল। বললো, এটা আমার কবরে দিতে বলব। ঐ রক্তমাখা রুমাল বাড়িতে রাখতে গিয়েছিল। বারবার বলতো "দেখিস রে। এতো বড়ো অন্যায় আল্লাহ সইবে না। রক্ত রক্ত টানে। জিয়া বাঁচবে না, বাঁচতে পারে না। আমি বলে রাখলাম তুই দেখে নিস। শালা ওসমানী, পাঁঠা। আচ্ছা বলতো, তুই বোস্টারের কথা বলেছিলে ?" ওর মাথার চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বললাম ৩-বার বলেছি। ঐ লোকটির মুখ আর দেখতে চাই না। কিন্তু নভেম্বর ১৭ তারিখে সিরাজুল ইসলাম ভূঁইয়া অনেকগুলি কাগজ এনে দিয়ে বললো, স্যার একদম ভেঙে পড়েছেন। এগুলি টাইপ করে বাসায় দিয়ে আসবেন।

বললাম, ভূঁইয়া, এখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাফ কোয়ার্টার আজিমপুর থাকি। এখন রাতদিন অফিসে আমাদের থাকতে হয়। সেখানে বউ একা থাকে। এগুলি টাইপ করবো কখন। গোয়েন্দারা অফিসে ঘুর ঘুর করে।

ওসব বুঝি না। টাইপ করে দিয়ে আসবেন।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও টাইপ করলাম। সেগুলি নিয়ে তার বাসায় গেলাম। তারিখটা ২৪ নভেম্বর ১৯৭৫, বিকাল চারটা। বঙ্গবীর কাগজগুলি হাতে নিয়ে বললেন, বল।

কি বলবো স্যার। সোবহানের কথায় বলি, সব শেষ হয়ে গেছে। সেনাশাসনকে আমরা ঘৃণা করতাম - এখন সেটাই আমদের ঘাড়ে চেপে বসলো। আপনারা ব্যর্থ। তবে জেএসডি এবার বড়ো আঘাত হানবে।

এমন সময় ১ম বেঙ্গলের সুবেদার মেজর ও শিক্ষা জেসিও আসলেন। আমাকে ভিতরে যেতে বলে উনি তাদের সঙ্গে কথা বললেন। তারা দশ মিনিট ছিলেন। শিক্ষা জেসিও (পরে মেজর) জামাল আমার কোর্সমেট বন্ধু।

বঙ্গবীর অনেক সময় টেলিফোনে কথা বললেন। টেলিফোন শেষ না হতেই কে যেন আসলেন। ব্যাটম্যান ফিস ফিস করে জানালেন, জেনারেল জিয়া। ও-দিকে একদম যাবেন না। জিয়া আধা ঘণ্টা ছিলেন। তাঁর আগমন আমাকে অবাক করলো। বঙ্গবীরের সঙ্গে আর দেখা না করে চলে এলাম। সকালে রেডিও খবরে শুনলাম, রাতে সরকার মেজর জলিল, মেজর তাহের, আ স ম আবদুর রবসহ অনেক নেতাকে আটক করেছে ।

ডিসেম্বর
১৯৭৫

বনানি ডিওএইচএস-এর বাসা। বললাম, স্যার, আমি যতদূর জানি, বঙ্গবন্ধু ১৯৫৫ সালে করাচিতে জাতীয় সংসদে "পূর্ববঙ্গের" স্থলে "বাংলাদেশ" করার জন্য প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকার পূর্ববঙ্গের স্থলে "পূর্ব পাকিস্তান" নামকরণ করেন। ১৯৭০ সালে বঙ্গবন্ধু "জয় বাংলা" বলতে শুরু করেন। মুক্তিযুদ্ধেও জয় বাংলা নামে মুক্তিসংগ্রাম পরিচালিত হয়। আমার প্রশ্ন হলো : "বাংলা" নামে কোনো দেশ ছিল না। এমতাবস্থায় মুক্তিযুদ্ধ "জয় বাংলা" নামে পরিচালিত হওয়াটা কি ঠিক হয়েছিল? কারণ বাংলা বলতে ত পশ্চিমবঙ্গও বুঝাত। তাহলে কি ধরে নিব মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশবাসীর মুক্তি সংগ্রাম সারা বাংলাকে মুক্ত করার ঐকান্তিক কামনা ছিল।

তোর প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর আছে। তোকে আগেও বলেছি, মুক্তিযুদ্ধের সময় ওপার বাংলার অধিকাংশ লোকের মনে তেমনি একটা আশার উন্মেষ হয়েছিল। সে জন্যেই পশ্চিমবঙ্গবাসী আমাদের মুক্তিসংগ্রামে বাজি ধরে সাহায্য করেছে। ওরা ধরেই নিয়েছিল, দুই বাংলা এক হচ্ছে। ওরাও দিল্লির কবল থেকে মুক্ত হচ্ছে।

কোনো নেতা বা ব্যক্তির সঙ্গে আপনার এ বিষয়ে কোনো আলাপ হয়েছিল কি?

(মৃদু হেসে উপরে চাইলেন) জবাব দিলেন না।

স্যার, জয় বাংলা বলায় দিল্লি সরকার বিরোধিতা করার কথা।

তারা করেও ছিল। সে জন্য বাংলাদেশের সীমানা ব্যাখ্যা মুজিবনগর সরকারকে দিতে হয়েছিল।

স্বাধীনতা-উত্তর জয় বাংলা বলার জন্য দিল্লি সরকার আর কোনো নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল কি?

করেছিল। কিন্তু ওটা বাঙালির স্লোগান বলে বঙ্গবন্ধু ওদের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছিল ।

স্যার, মুক্তিযুদ্ধের সময় জয়বাংলা জাতীয় ধ্বনি না রণধ্বনি ছিল?

রণ ধ্বনি জয় বাংলা, জাতীয় ধ্বনি, 'জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু' ।

স্বাধীনতা উত্তর রণধ্বনি কি করা হয়?

জয় বাংলা ।

স্যার, দেশটা ঢাকা কেন্দ্রিক হচ্ছে। ফলে নানা সমস্যা। চারটি প্রদেশ হলে ভালো হতো।

এখনো সময় আসেনি। আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ। প্রশাসন চালাবার টাকা নেই।

যতদিন প্রদেশ না হয় ততদিন বিভাগীয় কমিশনারকে ক্ষমতা বেশি দিতে হবে। প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। আর কমিশনারকে সচিবের পদ মর্যাদা দেওয়া উচিত। উন্নয়ন বাজেট তারই উপর ন্যস্ত করা উচিত।

ও রকম কিছু একটা করা যেতে পারে। আলাপ-আলোচনার দরকার।

স্যার, ভারত বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করছে বলে লোকজনের ধারণা।

নতুন দেশ তা কিছু করবে তো। ৩/৪ বছরে বঙ্গবন্ধু সামলে নিত। এখন কি যে হচ্ছে, কেউ কারো কথা শুনছে না। লুটপাট শুরু হয়েছে। আয়ুব খান যেমন করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকারের যে সমস্ত গোপন চুক্তি হয়েছিল, সেগুলি এখন প্রকাশ করা উচিৎ।

সাধারণত গোপন চুক্তি প্রকাশ হয় না। তাছাড়া আমরা তেমন কোনো গোপন চুক্তি করিনি।

তাজউদ্দিনের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু ভালো ব্যবহার করেন নি।

বঙ্গবন্ধু চাপে ছিলেন। কেটে যেত। তার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর খুব বেশি মত বিরোধ ছিল না। তাজকে দিয়ে তিনি অন্য কাজ করাতেন।

কি কাজ স্যার?

এখনো বলার সময় আসেনি। আর এখন বলেই বা কি হবে।

ভাসানী যেসব কথাবার্তা বলছেন, আমার খুব খারাপ লাগে।

বলার প্রয়োজন ছিল। তিনি সব সময়ই বলেন। তবে তার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সব সময় যোগাযোগ ছিল। ভাসানীর সব কথাবার্তার অর্থ বঙ্গবন্ধু বুঝতেন। না বুঝলে যোগাযোগ করতেন। মানসিকভাবে তারা এক ছিলেন।

স্যার, মুক্তিবাহিনীর সংগঠন সম্বন্ধে কিছু জানতে পারছি না।

তোকে কাগজ দিব (নিতে পারিনি)।

স্যার, আপনাকে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বলা হচ্ছে এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় আকাশবাণী থেকেও কয়েকবার তাই শুনেছিলাম। সরকারি নিয়োগ কি ছিল?

কমান্ডার ইন চিফ, বাংলাদেশ ফোর্সেস। তখনকার প্রেক্ষাপটে সর্বাধিনায়কই ছিলাম।

সরকারি কাগজপত্রে আপনার নিয়োগ C-in-C Bangladesh Armed Forces দেখেছি। সে যাক, সুপ্রিম কমান্ডারকে কি বলা হবে।

সশস্ত্র বাহিনী প্রধান ।

আভিধানিক অর্থ কিন্তু দুটোর একই স্যার।

তাই নাকি। তাহলে কমান্ডার ইন চিফ বলতে হবে।

সশস্ত্রবাহিনী হেড কোয়ারটারর্সে নিয়োজিত অফিসারদের মধ্যে পজিশন কি ছিল?

এসিওএস এর সমতুল্য। সেক্টর কমান্ডারদের পজিশন ৪র্থ ছিল। এখন এসব প্রশ্ন উঠে কেন?

সেক্টর কমান্ডারদের পজিশন আর ভারতের কমান্ডারদের পজিশন কেমন ছিল?

সেক্টর কমান্ডারদের পজিশন ভারতের ব্রিগেড কমান্ডারদের বরাবর ছিল। র‍্যাংক পজিশনে ভারতীয় কমান্ডারেরা সিনিয়র থাকলেও, রাষ্ট্রীয় পজিশনে বরাবর ছিল। তখন সেভাবেই ট্রিট করা হতো। তবে আমার কমান্ডাররা মেজর পদবির জন্য ওরা (ভারতীয়রা) মাঝে মধ্যে একটু হেলা করতো। এ নিয়ে মাঝে মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি হতো। আমরা ঠিক করে দিতাম।

সেক্টর কমান্ডারদের মধ্যে সিনিয়র কে ছিলেন?

মেজর সি আর দত্ত।

তাহলে প্রথম ব্রিগেড কমান্ডার জিয়াকে করা হল কেন?

তখনকার লিডারশিপ-এ যোগ্যতাই তাকে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর প্রথম ফিল্ড কমান্ডার করা হয়।

আমরা পাকিস্তানে (জিএইচকিউ) মেজর খালেদ মোশাররফ-এর কথা প্রায় শুনতাম। আমি নিজে অনেক অফিসারকে খালেদকে গালি গালাজ করতে শুনেছি।

মাঝে মাঝে মনে হতো মেজর খালেদ যেন জিএইচকিউ-তে হাজির হয়ে ওদের আক্রমণ করবে। নভেম্বর/ডিসেম্বর মাসে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, সন্ধ্যার পর রাওয়ালপিন্ডিতে লোকজনের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। যেন রাতে "বাঙালি বিচ্ছু" সেখানে উপস্থিত হয়ে আক্রমণ করবে। পাকিরা প্রকাশ্যেই ভয়ে ভয়ে বলতো। বাঙালি গেরিলাকে 'দুস্কৃতকারী' বলে প্রচার করে লোকজনকে সতর্ক হবার আহ্বান জানাত। লোকজন ট্রেন্সে থাকতেও ভয় পেত। তারা খালেদের নাম ধরে অভিশাপ দিত।

খালেদের অপারেশনগুলি খুব সাকসেসফুল ছিল। পাক বাহিনী খুব নাস্তানাবুদ হয়েছিল। বিশেষ করে তার গেরিলা অপারেশন। এ জন্যই তাকে ঢাকা এরিয়া দিয়েছিলাম। জুনিয়র না হলে তাকেই প্রথম ব্রিগেড কমান্ডার করতাম।

স্যার বাঙালি সিনিয়র অফিসারেরা পাকিস্তানে আটকে ছিলেন। ঐ সময় তাদের রিঅ্যাকশন আপনারা জানতে পেরেছিলেন?

হ্যাঁ। বিদেশি সোর্সে আমরা জানতে পেরেছি। ব্রিগেডিয়ার কুদ্দুস, ব্রিগেডিয়ার খলিল, জেনারেল ওয়াসি ওখান থেকে আসবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন।

আমি জানি স্যার। ব্রিগেডিয়ার কুদ্দুস ছুটি দিয়ে ঢাকায় এসে ফিরে যান। তাকে একা কোথাও যেতে দেওয়া হয়নি। একটা স্কোয়াড তার সঙ্গে ছিলেন।

আমরাও জানতে পারি। মুজিবনগর থেকে এ নিয়ে আমরা প্রোপাগান্ডা করেছি।

তারা কেউ আসলে কি তাদের প্রধান সেনাপতি হতেন?

না। প্রধান সেনাপতি আমিই থাকতাম।

জেনারেল ওয়াসি আপনার অনেক সিনিয়র ছিলেন।

ছিলেন। তবে তখন আমি সংসদ সদস্য ছিলাম। তাদের পেলে সশস্ত্রবাহিনীর পুনর্গঠন করা হতো। আমি ক্যাবিনেটে থাকতাম। ওয়াসিকে প্রধান সেনাপতি করা হতো। এসব কিছু বিপ্লবী সরকার নির্ধারণ করতেন আমি একা কিছু করতে পারতাম না। মনে রেখো তখন একটা নির্বাচিত সরকার কার্যকর ছিল। তার সরকার প্রধান অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ খুব দূরদর্শী, দক্ষ এবং প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন।

তখনকার সরকার কিন্তু রাষ্ট্রপতি নেচারের ছিল।

তা ছিল কিন্তু মূল ব্যক্তিত্ব ছিলেন তাজউদ্দিন আহমেদ। যে যাই বলুক বঙ্গবন্ধুর পরে তিনিই এ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান।

স্যার মাঝে মাঝে কিছু কিছু পত্রিকা এবং আলোচনায় অনেকেই স্বাধীন বাংলাদেশের জনক হিসেবে ভাসানীর নাম করছেন । আবার কেউ কেউ শেরে বাংলা একে ফজলুল হককে বলছেন।

ওরা কারা? বামপন্থী যারা ভাসানীকে ত্যাগ করে রাতের আঁধারে আখের গোছানোর দল। নিজের খাল খননের জন্য এখন ভাসানীকে নিয়ে নাচতেছেন। ওরা বুদ্ধিমান কিন্তু নীতিহীন। যারা শেরে বাংলাকে নিয়ে মাঠে নামতে চাচ্ছেন, এরা কিংবা তাদের প্রভুরা শেরে বাংলাকে ত্যাগ করেছিলেন, শেরে বাংলাকে ছুড়ে ফেলে জিন্নাহ লিয়াকতের পা চেটেছিলেন। এখন শেরে বাংলার ভক্ত হয়ে লাভ নেই। এরা আসলে বঙ্গবন্ধুকে সহ্য করতে পারে না। স্বাধীন বাংলাদেশকে মেনে নিতেও কষ্ট পাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলার জনক। এটা যেমন বিশ্ববাসী জানে তেমনি পাকিস্তান সরকারও জানে। তাছাড়া ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ এর আগেই তো দেশবাসী তাকে জাতির পিতা বলে বরণ করেছিলেন। সে সময়ের সংবাপত্রগুলি পড়লেই জানতে পারবে। তাছাড়া ভাসানী নিজেই বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীন বাংলার জনক বলে গর্ব করতেন। কারণ এক ঘরোয়া পরিবেশে ভাসানী বলেছিলেন, ওসমানী বলতো স্বাধীনতার পর কার কথা বেশি মনে পড়ে। তিনি নিজেই উত্তর দিলেন শেরে বাংলা বেঁচে থাকলে মুজিবকে চুমো খেতেন শুনে বঙ্গবন্ধু লজ্জায় রক্তিম হলেন। একাত্তরে পল্টন ময়দানে ৩রা মার্চ মূলত স্বাধীন বাংলার ঘোষণাসহ সবকিছুই ঘোষণা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু নিজেও উপস্থিত ছিলেন। সেদিন যে কয়টি বিষয়ে ঘোষণা দেওয়া হয় (একটা কাগজ দিলেন)।

(১) স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণা;

(২) স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান;

(৩) স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সীমানা;

(৪) স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাম বাংলাদেশ;

(৫) স্বাধীনতা রক্ষার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদ কমিটি গঠন;

(৬) মুক্তিবাহিনী গঠনের ঘোষণা;

(৭) স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান;

(৮) স্বাধীন বাংলার জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।';

(৯) স্বাধীন বাংলার পতাকা।

একাত্তরে এসব কারা কারা সমর্থন করেছিল আর কারা কারা তখন সমর্থন করেনি। এটা নির্ণয় কর। তাহলেই বুঝবে যারা আজকে উল্টা পাল্টা বলছে তারা কারা। আরো জানা দরকার ঐ ঘোষণাগুলি ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের হলেও হাই কমান্ড কর্তৃক অনুমোদিত ছিল। বঙ্গবন্ধু কিংবা হাইকমান্ড ছাড়া ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ এককভাবে কিছুই করেনি। যেসব ছাত্র নেতা এখন উল্টা পাল্টা বলছে তারা মূলত পথভ্রষ্ট হয়েছে ঠিক আমেনা বেগমের মতো। বঙ্গবন্ধু একা কিছু করেননি। তেমনি হাই কমান্ডও বঙ্গবন্ধুকে ছেড়ে একক কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি।

স্যার, বলা হচ্ছে সবাই মুক্তিযুদ্ধ করেছে।

সবাই করেনি। যুদ্ধ করেছে এক লক্ষ বিশ হাজার মুক্তিযোদ্ধা-মুক্তিবাহিনী সৈনিক। যারা তখন সরাসরি বিরোধিতা করেছেন যেমন - মশিউর রহমান, আলিম, গোলাম আযম প্রমুখ। এখন এরাই স্বাধীনতার পরে সকল গোলমালের হোতা। এরাই মির জাফরদের উত্তরসুরি। অসৎ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, আমলা, মৌলবাদিরা, সরকারি কর্মচারী, ক্ষমতালোভী সামরিক অফিসার এরা সবাই দুর্বল প্রশাসনের সুযোগ গ্রহণ করে। অথচ তখন সরকারি প্রতিকূলতা ছিল অনেক, যেমন :

(১) যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে দুই কোটি বাস্তুহারার পুনর্বাসন;

(২) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা;

(৩) আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা;

(৪) বিশ্ব জুড়ে খাদ্য, জ্বালানি ও সারের মূল্য বৃদ্ধি;

(৫) বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যহীনতা;

(৬) মূল্যস্ফীতি ও মুদ্রাস্ফীতি দেশ শাসনে বিঘ্ন সৃষ্টি;

(৭) বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী ও ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ ও তাদের কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার;

(৮) ভারতীয় সৈন্য ফেরত পাঠান;

(৯) বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের স্বীকৃতি লাভ;

(১০) দক্ষ কর্মচারীর শূন্যতা;

(১১) পুলিশ, বিডিআর ও সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন;

(১২) পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা বিতরণে সরকারি ব্যর্থতা;

(১৩) আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের দলীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া;

(১৪) পাকিস্তানে আটক বাঙালি সরকারি কর্মচারীদের প্রত্যাবর্তন ব্যবস্থা;

(১৫) সরকারের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অনভিজ্ঞতা;

(১৬) পাকিস্তানের ঋণের অংশ বহনের জন্য দাতা গোষ্ঠীর অন্যায় চাপ ও বৈদেশিক সাহায্য বন্ধ করা;

(১৭) ১৯৭৪ সালের বৈদেশিক মুদ্রা সংকট;

(১৮) ১৯৭২ সালের অনাবৃষ্টিতে ফসল হানি, ১৯৭৩ সালের অতি বৃষ্টি ও বন্যা এবং ১৯৭৪ সালের ভয়াবহ বন্যা ও খাদ্য ঘাটতি ও দুর্ভিক্ষ;

(১৯) যোগাযোগ সমস্যা;

(২০) সৈন্যবাহিনীর একাংশের অসহযোগিতা;

(২১) পাকিস্তান যুদ্ধবন্দিদের বিচার সমস্যা;

(২২) জরুরি অবস্থা ঘোষণায় সাংবিধানিক সংশোধনী ১৯৭৩;

(২৩) বিশেষ ক্ষমতা আইন;

(২৪) আমেরিকার একাত্তরে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ নীতি। (তার ডাইরির পাতা থেকে আমি নোট করি)।

স্যার, বঙ্গবন্ধুর দল ত্যাগ করায় আমরা খুব কষ্ট পেয়েছিলাম।

হ্যাঁ, দল ত্যাগ করা আমার ঠিক হয়নি। শহীদ সাহেবের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর অনেক মত পার্থক্য ছিল কিন্তু তাকে তিনি ত্যাগ করেননি। আমরা তাঁকে ছেড়ে আশায় সিআইএ একটা বড়ো সুযোগ পায়। একবার বঙ্গবন্ধু আমাকে বলেছিলেন, সেনাপতি আমার বিরোধিতা করো, কিন্তু আমাকে একা করো না, আমাকে শক্তিহীন করো না। আমি যা কিছু করেছি দেশের জন্য করেছি। আমারও ভুল হতে পারে।

স্যার, বঙ্গবন্ধুর হত্যার জন্য সিআইএ কে দায়ী করবো?

একশো বার। ফারুক, রশিদ, জিয়া-মোশতাক সিআইএ-এর সাহায্যেই আগস্টে অঘটন ঘটিয়েছে। তাছাড়া এখানে এখনো যা হচ্ছে সবই ওদের কারসাজি। বাংলার স্ট্যাবিলিটি আমেরিকা-ইন্ডিয়া চায় না। ওরা বাংলাকে ভারতের সঙ্গে মিলাতে চায়, বিনিময়ে ভারতের আমেরিকাকে সমর্থন। জাতিসংঘে ভেটো শক্তির অধিকারী হওয়া।

স্যার, ওরা কারা ?

সিআইএ'র এবং আইএসআই সবাই। ওরা বেঙ্গলের উন্নতি চায় না স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব তারা দেখতে চায় না ।

মার্চ
১৯৮০

[একজন মুক্তিযোদ্ধা একজন রাজাকার অফিসারকে স্যালিউট না দিবার জন্য তার মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল, রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করে যাবজ্জীবন জেল দিয়েছেন। তাছাড়া শত শত লোককে মৃত্যুদণ্ড, জেল ইত্যাদির কারণে মন খুব খারাপ ছিল। অনেকক্ষণ

অপেক্ষা করার পর তিনি কাছে ডাকলেন। সালাম দিলেম। কাকেও এখন ভিতরে আসতে দিবে না বলে দিলেন।]

কিরে এতোদিন কোথায় ছিলে ?

আপনি এখন খুব ব্যস্ত। স্যার, আমার খুব মন খারাপ। মনে হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের এদেশে বাস করতে দিবে না।

কেন এখন মোশতাক ক্ষমতায় নেই, তোমাদের আক্কেল ক্ষমতায়।

কিন্তু আপনি নিশ্চয় এখন অনুতপ্ত, ঐ লোকটি ইচ্ছা করে খুনিদের সূর্য-সন্তান বলেছেন।

বলেছেন। কিন্তু কথাটা তাকে দিয়ে বলানো হয়েছিল।

স্যার, সেনাসদরে স্বাধীনতার বিরোধিতা করা অফিসারে ভরে গেছে-এরা শিবির করতো।

তো আমি কি করতে পারি।

মুক্তিবাহিনীর প্রধান হিসেবে আপনার বলা উচিৎ। রাজাকারদের সরকারি চাকরিতে না নিতে।

আমি তো অনেক কথাই বলি। আমার কথা কে শোনে?

প্রেস কনফারেন্স করে বলুন।

আমার কথা প্রেস প্রচারই করবে না। করতে দিবে না।

তাহলে বিদেশি সাংবাদিককে বলুন?

আমি সব রকমের চেষ্টাই করছি। স্বাধীনতা পেয়ে দেশের লোক বেসামাল হয়ে পড়েছে। শুধু লুটপাট করে খাচ্ছে। কোনো ভালো কথার ধার ধারছে না। দুই-দশ বছরে পাপ মোচন হবে না। আমার তো দিন শেষ।

স্যার, সেনাসদরের লাল মসজিদের ইমাম সাহেব "জয় বাংলা" না বলে জিন্দাবাদ বলার পক্ষে উকালতি করতে শুনেছি।

ওরা ওদের দ্বারা সুকৌশলে প্রচার চালাচ্ছে।

কয়েকজন অফিসারকেও জয় বাংলা না বলার এবং বাঙালি না বলার জন্য বলতে শুনেছি।

সম্ভবত গোয়েন্দা বাহিনীর অফিসার দ্বারা জিয়া এসব করাচ্ছে। তোমার সেই মান্নান আগে কোথায় চাকরি করতো।

আইএসআই সদরে, ইসলামাবাদ।

তার মতে অফিসার কতো হবে বলেছিলে?

অর্ধশত। অফিসার জোয়ান মিলে তিন শত।

আরো বেশি হবে। বেঙ্গল রেজিমেন্টর একটি ব্যাটালিয়ান জিয়ার একেবারে অনুগত ছিল।

সেই যে একবার বলেছিলেন আপনি বেঙ্গল রেজিমেন্ট নামকরণের জন্য চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পাকিস্তানিরা ইস্ট বেঙ্গল রাখে। স্বাধীন দেশে এখন নাম পরিবর্তন করা যায় না কি?

এখন পরিবর্তন করা ঠিক হবে না। স্বাধীন বাংলাদেশের সঙ্গে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট একাকার হয়ে গেছে। (ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠা, নামকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বঙ্গবীরের অবদানের বর্ণনা আমার লেখা বই 'বাঙালি স্বাধীন কমান্ডার'-এর দশম পরিচ্ছেদ পৃষ্ঠা ১৫০-১৫৮-তে রয়েছে।)

স্যার, বেয়াদবি মাপ করবেন। আপনার কথা থেকে একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠনে মি. জিন্নাহ'র অবদান গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

ওসমানী জিন্নাহর কথা শুনে প্রথমে রেগে গেলেন কিন্তু পরক্ষণেই শান্ত হয়ে বললেন, অবদান ঠিক না। আগেই বলেছি চল্লিশ দশকে শেরে বাংলার সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তিনি বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠনের পক্ষে ছিলেন না। ঘটনাচক্রে অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন।

তখন রাজনৈতিক কারণে ইস্ট বেঙ্গলের অবস্থা ঘোলাটে ছিল। শেরে বাংলা সোহরাওয়ার্দী বৃহৎ বেঙ্গলের জন্য চেষ্টা করছিলেন। মি. জিন্নাহর ভয় ছিল জনগণ যদি আবার তাদের দিকে ঝোঁকে তাহলে ইস্ট বেঙ্গল তার হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

১৯৪৬ সালে জিন্নাহ যখন কলকাতা এলেন শেখ মুজিব বেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা হবে কিনা তা সরাসরি জানতে চেয়েছিলেন। জিন্নাহ তখন হাঁ বলেছিলেন এবং দেশ বিভাগের পর ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। তখন মি. জিন্নাহ সেভাবে সহযোগিতা না করলে পাঞ্জাবিরা ইস্ট বেঙ্গল গঠন হতে দিত না। আমি যতদূর জানি পাঞ্জাবিরা এবং উত্তর ভারতের আগত মুসলমানেরা শুরু থেকেই বাঙালিদের শাসন ক্ষমতায় অংশ গ্রহণে বিরোধিতা করছিল। তবে মি. জিন্নাহর আরো একটি খেয়াল থাকতে পারে, আর তা হলো সেনাবাহিনীতে পাঞ্জাবিদের একচেটিয়া দখলদার থেকে দেশকে রক্ষার জন্য সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের একটি সংগঠন থাকা এবং পরবর্তীতে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টর মতো একটা সিন্ধু রেজিমেন্ট গঠন করা। তিনি বেঁচে থাকলে হয়ত তা করতেন।

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ফজলুল কাদের চৌধুরীর অবদানের কথাও কিন্তু আমরা কখনো বলি না স্যার।

তাদের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে যুগে এ যে কত বড়ো গুরুত্ব এবং ঝুঁকিপূর্ণ ছিল তা এখন বোঝা যাবে না। এরা কেউ বুঝতেও পারবে না। এসব কথা এরা কেউ জানেও না বোঝেও না।

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে এ দুই নেতার স্মৃতিফলক থাকলে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য ভালো হতো।

হাঁ, ভালো আইডিয়া।

সেনাপ্রধানকেই বলুন স্যার। তিনি তো এসব জানেন।

সেটাই সমস্যা। আর জানলেও তারা তো স্বীকার করতে চাইবে না। এরা তো বঙ্গবন্ধুর নামই শুনতে চায় না। (একটা দীর্ঘশ্বাস).

স্যার, শেরে বাংলা ওয়ার কাউন্সিলে যোগদান করেন বাঙালি পল্টন গঠন হবে আশায় তবে কি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের স্বপ্নদ্রষ্টা শেরে বাংলাকে বলবো।

ওসমানী-ইয়েস। হি অ্যালোন ফট ফর ইট। এ জন্য তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার নষ্ট হয়েছে। আমাদের লোকেরা তার মর্মকথা বোঝে না।

স্যার, অনেকে বলেন যে, কুমিল্লা আর বরিশালের লোকেরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে। অথবা তার হত্যার জন্য তারা দায়ী

কথাটা আংশিক সত্য। দেশ স্বাধীন হবার পর সরকারি চাকরি লাভে কুমিল্লার কোটা শেষ হয়ে যায়। বরিশালেরও। এই দুই জেলার লোক কোটা পদ্ধতি তুলে দিবার জন্য দাবি তোলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কোটা পদ্ধতি বলবত রাখার জন্য কঠোর নির্দেশ দেন। এতে কুমিল্লা ও বরিশালের লোকেরা বেশি আহত হন। এরা তখন মোশতাকসহ অন্যান্য নেতাদের প্রভাবিত করতে চেষ্টা করে। তবে ক্ষমতা লোভী কিছু লোকই সিআইএ/আইএসআই-এর সঙ্গে মিলে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে। জিয়া-এরশাদের বাড়ি তো কুমিল্লা ছিল না। তবে কুমিল্লা পার্টি জিয়া এরশাদকে ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করেছে। পাঞ্জাবিরা যেমন খাজা নাজিমুদ্দীন, মোহাম্মদ আলী প্রমুখের উপর ভর করে কাজ বাগিয়েছেন, সেই সঙ্গে একটা অদৃশ্য শক্তি আমলাদের প্রভাবিত করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমলারা তেমন সুবিধা করতে পারে না। কিন্তু স্বৈরশাসনে আমলা ও সরকারি কর্মচারীর সুবিধা বেশি। স্বাধীনতার পর তাই সরকারি কর্মচারীরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারেনি। আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা ক্ষমতা পেয়ে দেশে শান্তি শৃংখলা রক্ষার নামে দলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করাতে চেষ্টা করে। তারা কোনো (নিয়ম-কানুন) মানছিল না। তারাই যেন আইন-কানুন। দলীয় নেতা ও কর্মিদের ব্যর্থতার জন্য আমলারা সুযোগ পায়। তারা সরকারি কর্মচারীদের উসকে দেয়। এমনিই দেশে অর্থকরী নেই, তার উপর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল অবস্থা, কর্মচারীদের হরিলুট প্রবণতা, সেনা কর্মকর্তাদের ক্ষমতা দখলের সুযোগ করে দেয়। যেহেতু সেনাবাহিনীতে বিশেষ জেলার একচেটিয়া, তারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে। তারা ধরে নিয়েছিল, বঙ্গবন্ধু না থাকলে কোটা পদ্ধতি উঠে যাবে, তখন তারা বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

জুন
১৯৮০

পরিচালক কর্নেল এম এ রব আমাকে ওসমানীর পেনশনের কথা জিজ্ঞেস করলেন। সেই সূত্র ধরে তার বাসায় গিয়ে পেনশনের বিষয়টি জেনে নিতে বললেন এবং এ ব্যাপারে একটি পেপার তৈরি করতে বললেন। আমি বঙ্গবীরের বাসায় গেলাম। পেনশনের বিষয় আলাপ করতে চাইলে তিনি মনক্ষুণ্ন হয়ে বললেন, আমি

ভিক্ষা চাই না। প্রধান সেনাপতি হিসেবে যুদ্ধ করেছি, সেই হিসেবে আমার পেনশন চাই। এ বিষয়ে তার সঙ্গে আমার বিস্তারিত আলোচনা হলো। এক সময় বললেন, বঙ্গবন্ধু আমাকে ব্লাঙ্ক চেক দিতে চেয়েছিলেন। নিয়ম মোতাবেক পেনশন যদি বৃদ্ধি না হয় তবে তার আর দরকার নেই। আমি তো কিছু বলি না। সাংবাদিকরাই না বোঝে উল্টা-পাল্টা লিখে। ওরা আর সুযোগ পাবে না। এখন বলো ওখানের খবর-টবর কি?

আমার চেয়ে তো আপনিই ভালো জানবেন। তবে জেনারেল মঞ্জুর মৃত্যু রহস্যটা বুঝতেছি না। তবে যে যাই বলুক, জিয়াকে তিনিই মারিয়েছেন।

কারণ ?

কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। এক এক করে সব মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের তিনি শেষ করবেন, এক সময় তিনি এ দেশকে পাকিস্তানের সঙ্গে একটা যোগসূত্র স্থাপন করবেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করবেন।

আর কি কারণ?

ক-দিন আগে মেজর খালেদ চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় এসেছিলেন, কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন জিয়া কখনোই কোনো মুক্তিযোদ্ধাকে চিফ বানাবে না।

আর কোনো কারণ ?

স্যার, ২৮ শে মে জেনারেল মঞ্জুর, কর্নেল নওয়াজেশ ও মেজর খালেদ সেনাসদরে এসেছিলেন। ঘটনাক্রমেই আমাদের অফিসের বারান্দায় দু-বার জেনারেল মঞ্জুর সামনে পড়ি। সালাম দিলাম, মনে হলো উনি আমাকে দেখতে পাননি। উনি চলে যাবার দশ-পনেরো মিনিট পরে সুপ্রিম হেড কোয়াটারের সুপারিনটেনড্যান্ট, সুবেদার রমজান কাঁপতে কাঁপতে আমার অফিসে এসে জানায়, জেনারেল জিয়ার সঙ্গে মঞ্জুরের কথা কাটাকাটি হয়েছে।

রমজান আমাকে প্রশ্ন করেছিল, "স্যার একজন জেনারেল কি রাষ্ট্রপতিকে বলতে পারে "I will see you "

জেনারেল মঞ্জুর প্রথম সাক্ষাতের পর আমি জ্যাগ (Judge Aduocate General) ডিপার্টমেন্টের বারান্দায় আমার সাবেক পরিচালক কর্নেল নওয়াজেশকে দেখতে পেয়ে কাছে গিয়ে সালাম দিয়েছিলাম। তিনিও আমার সালাম নেননি। তিনিও যেন আমাকে দেখতে পাননি। আমি খুব অপমানিত হয়েছিলাম। সুবেদার রমজান আমার কাছ থেকে চলে যাবার পর মেজর খালেদ আমার অফিসে ঝরের বেগে এসেছিলেন, হাত মিলিয়ে চলে যান। একদিন পরেই তো চট্টগ্রামের ঘটনা ঘটে। ৩১ শে মে সকালে অফিসে আসবার প্রাক্কালে জ্যাগ মেজর মুজিব, মইনুল রোডে চলতে চলতে বলেছিলেন, "দেশের খবর জানেন, চট্টগ্রামে জিয়া মারা গেছেন।" আমি অবাক হয়ে তার মুখের প্রতি চেয়ে রইলাম। মেজর (পরে ব্রিগেডিয়ার) মুজিব আবার বললেন, "মঞ্জুর ঠিক কাজটিই করেছেন। জিয়া বড়ো বাড়াবাড়ি করছিলেন।" মেজর মুজিব জেনারেল মঞ্জুর-এর কট্টর সমর্থক বলে সেনাসদরে সবাই অবগত ছিলেন।

দেখ কোর্ট কি বলে? এ নিয়ে বেশি মাতামাতি করিস না-বিপদ হবে।

স্যার, এপার বাংলা এখন স্বাধীন, কিন্তু ওপার বাংলার লোকেরা স্বাধীন হবার কোনো প্রকার দাবি করছে না। এ বিষয়ে তাদের কোনো আন্দোলন নেই। ওপার বাংলার সাহিত্যকর্মেও তার কোনো প্রভাব নেই। স্যার, প্রশ্নটা এ জন্য করলাম, পাকিস্তানে আপনি দুই বাংলার স্বাধীনতার কথা বলতেন।

ওপার বাংলা স্বাধীন করা কিংবা এপার বাংলার সঙ্গে মিলে বৃহৎ বঙ্গের জন্য ওরা সরাসরি কোনো আন্দোলন করছে না ঠিক কিন্তু ওপার বাংলার শতকরা ৯০% জন বাঙালিই চায় তারা স্বাধীন হোক। অথবা এপারের সঙ্গে মিলে মহাবঙ্গ সৃষ্টি হোক। আমি বহু বাঙালির সঙ্গে একাত্তরে আলাপ করেছি। তারা মনে প্রাণেই আশা করেছিল যে, এপার বাংলা স্বাধীন হবার পর দুই বাংলা একত্রিত হবার প্রক্রিয়া শুরু হবে। ভাসানী দুই বাংলা এক করার দাবি তুলেছিলেন কিন্তু দিল্লির কৌশলে সে আন্দোলন গড়ে উঠেনি

১৯৪৭ সালে বাঙালি মুসলমান ভারতীয় হিন্দুদের আদিপত্য মানতে রাজি ছিল না। কারণ তখন হিন্দুরা সবরকম প্রশাসনিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। উচ্চবর্ণের মুসলমানের পাকিস্তান নামক ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্য ছিল তারা গরিব মুসলমানদের উপর মাতব্বরি করবেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তাদের সে উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছে। গরিব মুসলমানদের নিকট তাদের স্বধর্মের উচ্চবর্ণের নেতাদের হিন্দুদের চেয়ে কম অত্যাচারী শোষক মনে হয়নি। বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানদের। অচিরেই তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে এবং শেরে বাংলা, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করে। তেমনি বাঙালি হিন্দুরা ১৯৪৬-৪৭ এ মুসলমান শাসকদের নেতৃত্বে মানতে চায়নি। তাই তারা ভারত ইউনিয়নে যোগ দেয়। বাঙালি মুসলমানদের মতোই তারা ভারতীয় হিন্দুদের নিকট শাসন, শোষণ, নির্যাতিত হতে থাকে। তারা বুঝতে পারে যে বাঙালি হিন্দু কোনো দিন দিল্লির সুনজরে পড়বে না। সেই আগের মতোই তারা অবহেলিত, নির্যাতিত হতে থাকবে। কিন্তু তখন তাদের করণীয় কিছু নেই। কানার লাঠি হাত ছাড়ার কাহিনী। পাকিস্তানিরা যেমন মুসলমান বাঙালির নেতৃত্ব মানতে রাজি না। তারা আগে যেমন নেতাজীর নেতৃত্ব মানে নাই। তারা তাদের অসহায় অবস্থার কথা বুঝতে পারছেন কিন্তু কিছু করতে পারছেন না। ১৯৪৭ সালের মনোভাব এখন তাদের নেই। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ফরমুলা অনুসারে হিন্দু-মুসলমান একত্রে বসবাস করা যায়। এখন এটা তারা বুঝতে পারছেন। কিন্তু বসবাসের অনুকূল অবস্থা এখনো হয়নি। আগামী দিনে অবশ্যই হবে। নিরাশ হবার কিছু নেই। মহামিলনের হাতছানি আমি একাত্তরে কোটি কোটি বাঙালির মধ্যে দেখেছি। বাঙালির ভবিষ্যৎ অবশ্যই উজ্জ্বল।

স্যার, আয়ুব খানের নির্বাচন ফরমুলা এখন বাংলাদেশে কার্যকর হচ্ছে। আপনার কথা অনেক লোককে বলেছি কিন্তু দশ ভাগ লোকেও তা বিশ্বাস করে না।

আয়ুব খানের ভোট জালিয়াতি বাঙালিরা জানে না। মিলিটারি জান্তারা ঠিক করেছিল, আয়ুব খানকে জিতাবেই। আয়ুবখানের একা কিছুই করার ছিল না।

এসব ঝামেলা থেকে বাঁচার জন্য তিনি নির্বাচনের দায়িত্ব সেনাবাহিনীকে দেন। সেনাবাহিনীর লোকেরা প্রত্যেকটি ভোট কেন্দ্রে না গেলেও অধিকাংশ ভোট কেন্দ্রের ভোটের ফলাফল উল্টে দেয়। জান্তারা আগেই সে ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। সেনা সদস্যরা ভোটারদের প্রভাবিত করে। কোথাও কোথাও নিজেরাই ভোট দিয়ে ব্যালট বাক্স ভর্তি করে। কোনো কেন্দ্রের ব্যালট বক্স পরিবর্তন করে। একমাত্র বেঙ্গল রেজিমেন্ট যেসব স্থানে ছিল সেখানে নিরপেক্ষ ভোট হয়েছে। এমনকি ফলাফল পরিকল্পিতভাবে প্রচার করা হয়। রেফারেন্ডাম, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, সংসদীয় নির্বাচন-সবগুলি। কোন্ কেন্দ্রে কত ভোট দিতে হবে এসব ফরমেশন কমান্ডার আগেই ঠিক করে দিয়েছিল। একেক জন ৫০/৬০টি জাল ভোট দেয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক অফিসার এটা গর্বিত কাজ মনে করেছেন। অনেক অফিসার আমাকে বলেছেন।

স্যার, আপনি যখন দেখলেন গণভোট ও রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে ভোট জালিয়াতি হয়েছে তখন বিজয়ী প্রার্থীকে অভিনন্দন জানালেন কেন ?

বিজয়ীকে অভিনন্দন জানান গণতান্ত্রিক শিষ্টাচার।

ওসব নির্বাচন তো গণতান্ত্রিকভাবে হয়নি। আপনিই তো বলেছেন ভোট জালিয়াতি হয়েছে। তখন অন্যায়কে সমর্থন করা ঠিক হয়নি। লোকে তাই বলছে।

আমার প্রতিক্রিয়া জনগণকে পরে জানিয়েছি। তাছাড়া তখন সামরিক শাসন। বেশিকিছু বলার উপায় ছিল না। সেনাবাহিনীতে ঘন ঘন ক্যু হচ্ছে। জনগণের মধ্যে আওয়ামী খতম প্রচারণা ব্যাপক। দেশটা আরো অবনতিশীল অবস্থায় পড়ুক এ আমি চাইনি।

আপনার কি মনে হয় ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা পাবে ?

মনে হয় না। আয়ুবের গণভোট, সংসদ ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ন্যায় বাংলাদেশের নির্বাচনগুলো যেভাবে হলো, সংবিধান যেভাবে সংশোধন করা হয়েছে। তাতে মনে হয় না দেশে স্থিতিশীল অবস্থা ফিরে আসবে। ছোটো দলের কথা বাদ দাও, আওয়ামী লীগের পক্ষেও সম্ভব হবে না। কারণ বাংলাদেশের মতো গরিব দেশে আর্মি একটা ফ্যাক্টর। তাই আর্মি যে পক্ষ নিবে তারাই জিতবে। আমাদের আর্মি জিয়াকে পছন্দ করে। এরা পাকিস্তানি, অন্য সব দলকে ভারতীয় দালাল বলে গালাগাল দিচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও এরূপ ধারণা দেওয়া হচ্ছে। একদিকে আমলাদের সীমাহীন দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে অন্যদিকে ভিত্তিহীন প্রচার মাধ্যমে জিয়াকে হিরো করা হচ্ছে। এমন করে পাঁচ-দশ বছর আয়ুবের মতো চলে যেতে পারে। তারপর মেরুদণ্ডহীন জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। একাত্তরে যেমন পাকিস্তান গেল। এজন্য সবাইকে সৎ ও সত্যবাদি হতে হবে। নইলে এখানে আর একটা স্পেন হবে। মুসলমান নিঃশেষ হবে।

স্যার, পাকিস্তান থেকে ফিরে দেখলাম, বিশেষ জেলার লোকেরা সরকারে বিরুদ্ধে সোচ্চার। আর পঁচাত্তরের পরে দেখছি, ঐ অঞ্চলের লোকজন জেনারেল জিয়াকে খুব বেশি সমর্থন দিচ্ছেন ?

বাংলাদেশের প্রশাসনে মোটামুটি ঐ দুই জেলার লোক বেশি। বঙ্গবন্ধু সরকার জনপ্রতিনিধিমূলক সরকার। এখানে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের গুরুত্ব বেশি। প্রশাসন

কর্মকর্তারা সাধারণত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অধীনে থাকতে ভালোবাসেন না। তারা মনে করে তারাই সবকিছু। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের উপর অনেক খবরদারি করছেন। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় সরকারি অর্থের লুটপাট কম হয়। কিন্তু স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় লুটপাট ব্যাপক হয় এবং প্রশাসনের লোকজন সিংহভাগ হজম করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারি কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা নিয়ন্ত্রিত হয়। তখন তারা সরকার বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। যে অঞ্চলের লোকজনের কথা বলছো তারা এখন সুযোগ-সুবিধা বেশি পাচ্ছেন তাই তারা জিয়া তথা স্বৈরশাসনকে বেশি পছন্দ করছেন। জিয়া মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও তার সরকার হচ্ছে আয়ুবী আমলাতান্ত্রিক সরকার। তার সরকারে টাকা-পয়সার যা লুটপাট হচ্ছে তা আমলাদের ভাগ-বাটোয়ারার মাধ্যমে হচ্ছে। ধরো খাল কাটার বিষয়। এটা এমনই একটা পদ্ধতি যা আসলে টাকা মারার ব্যবস্থা। খাল কাটার পর বৃষ্টি হলে তার কোনো চিহ্ন থাকে না। টাকা সবাই মিলে ভাগ-বাটোয়ারা হয়।

লোকজন খুশি হয়। আমলারা সরকারি কর্মচারীরা সবাই খুশি। তাদের সুযোগ সুবিধা তিন-চারগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। চাকরিও হচ্ছে আবার ব্যবসা-বাণিজ্যও হচ্ছে।

স্যার, জিয়া কবি নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবি ঘোষণা করেছেন? আমার মনে হয়, নজরুল জীবিত থাকলে, সুস্থ থাকলে ঐ সরকারের এক নম্বর শত্রু হতেন।

তবুও কোনো চামচা নয়, একজন ভালো লোক জাতীয় কবি হলেন। কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। তাঁকে বাংলাদেশের জাতীয় কবি করা হলে তাঁকে ছোটো করা হতো। নজরুল সকল বাঙালির কবি। বাংলাদেশের জাতীয় কবি ঘোষণা করায় তাঁর মান-মর্যাদা বাড়েনি। কারণ, তাঁর গৌরবময় জীবনে বাঙালি মুসলমানেরা তাকে অপছন্দ করতেন। কবি নজরুল ইসলাম মুসলমানদের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে ছিলেন। মুসলমান আলেম সমাজ তাঁকে কাফের আখ্যা দিয়েছিলেন। ফরিদপুর থেকে একবার নির্বাচন করেছিলেন তিনি, কিন্তু মুসলমান তাঁকে ভোট দেয়নি। মুসলমানেরা কবি নজরুলকে নানাভাবে অপমানিত, লাঞ্ছিত করেছে। নজরুল সুস্থ থাকলে, ভালো থাকলে এ সরকারে বিরুদ্ধে লিখতেন, এ সরকার নজরুলের মতো কবিকে এদেশে প্রবেশ করতে দিত না। কবিকে জাতীয় কবি করার অর্থ হলো পাকিস্তানি স্টাইলে মৌলবাদকে সমর্থন করা। নজরুল যা যা পছন্দ করতেন না, এ সরকার তাই তাই করছেন। ১৯২৮ সালে কবি নজরুল ইসলামকে বাঙালিরা বাঙালির কবি, বাঙালি জাতীয় কবি বলে বরণ করেছিলেন। তিনি সাম্যবাদী কবি ছিলেন। নজরুল বাঙালি জাতীয় কবি ছিলেন। আমরা তাকে বাংলাদেশি কবি করলাম।

তিনি হিন্দু বৌদ্ধ-খ্রিস্টান বাঙালিদেরও কবি নন। যারা বিসমিল্লাহ বলেন তাদের কবি। তাকে বাংলাদেশি কবি করা মানেই তাকে ছোটো করা। ইহা করা হয়েছে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে। এরা যদি তাকে বিশ্ব কবি অথবা মহাকবি বলতেন তাহলেও একটা কাজের মতো কাজ হতো।

স্যার, মাঝে মাঝে খুব কষ্ট হয় যখন বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিতরা আপনাকে মোশতাক-এর লোক বলে এবং জিয়ার ক্ষমতায়নের সহযোগিতা করেছেন বলে

দোষারোপ করেন। ভাবি কেন যে আপনি মোশতাকের উপদেষ্টা হয়েছিলেন।

তোকে আগেও বলেছি, মোশতাক ছিলেন তাজউদ্দিনের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর শত্রু তো দূরে থাক সমালোচকও ছিলেন না। সি আই এ জিয়া গং-এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে। এ অবৈধতাকে বৈধতার দিবার জন্য মোশতাককে টেনে আনে। শর্ত ছিল তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন দিবে। বেসামরিক সরকার গঠিত হবে। এই একই শর্তে আমি মোশতাকের উপদেষ্টা হই এবং সামরিক শাষণ ঠেকাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি। বলতে পারো রাজনৈতিক নেতাদের ব্যর্থতার জন্যই আমিও ব্যর্থ হই - জিয়া জয়ী হয়।

সামরিক শাসনকে আমি কোনোদিন সমর্থন করিনি। তুই জানিস, আমি আইয়ুবের সরাসরি বিরোধিতা করেছিলাম।

জুলাই
১৯৮১

আমার মেয়েকে ট্রেন দেখিয়ে বাসায় ফিরছিলাম। আমি তখন মইনুল রোডে। জেনারলে এ আর খানের বাসার নিকট দেখি বঙ্গবীর ওসমানী হাঁটছেন। সালাম দিলাম। মেয়েকে আদর করে বললেন, চল ঘরে চল, কথা আছে। মেয়ের চোখে ঘুম। তাকে শুইয়ে দিলাম। আমাকে অনেকগুলি কাগজ দিলেন। এক সপ্তাহের মধ্যে টাইপ করে দিস। তা বল ত তুই এখন কোথায় কাজ করছ।

পে-পেনশন পরিদপ্তরে।

তুই কি ওখানে পার্মানেন্ট। পাকিস্তানেও ওখানে ছিলে।

স্থায়ী না স্যার। তবে ওখানেই কাজ করি।

তালুকদারের পরিবারের কি অবস্থা।

আমি ঠিক জানি না স্যার। তবে আপনার মেসেজ তার পরিবারকে দু-বার পাঠিয়েছি। এসিসি রেকর্ড অফিসেও বলেছি।

আচ্ছা বলতো, প্রতিরক্ষা বাহিনীতে এসব কি হচ্ছে?

এ জন্য ত আপনারাই দায়ী স্যার। আমরা পাকিস্তান থেকে ফিরে তিনটি বছর অলসভাবে বসে ছিলাম। পায়ে স্যান্ডাল পড়ে পিওনের মতো অফিস করেছি। ক্লার্ক ছাড়া কারো কাম কাজ ছিল না। অনেকে তবলিগ করতো। '৭৫ এর পরে যেমন ইউনিফরম দেওয়া হলো, ঢাকার বাহিরে পাঠানো হলো, সে কাজটা ১৯৭৪ সালে হলে আজ এ অবস্থা হতো না। সৈনিকেরা রাজনীতি করতো, জেএসডিতে নাম লিখালো, কর্তৃপক্ষ সব জেনেও নীরব থাকল। আপনাকেও কতবার বলেছি।

সরকারের অবস্থা তখন ভালো ছিল না।

ভালো-মন্দের ব্যাপার নয় স্যার। সৈনিকেরা দু-বছর পাকিস্তানের ক্যাম্পে ক্যাম্পে অমানবিক জীবন-যাপনের পর দেশে এরূপ অবস্থা আশা করেনি। আসলে সরকার সৈনিকের মর্মব্যথা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়।

শেখ মনিরাই এ জন্য দায়ী। তারা বঙ্গবন্ধুকে মিসগাইড করে।

আপনারা ত ছিলেন স্যার।

চেষ্টা করেছি, পারিনি। ওদের নিকট ব্যর্থ হয়েছি।

এরশাদকে বঙ্গবন্ধু কেন অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল বানালেন। তার মতো লোককে তো আর্মিতে রাখা উচিৎ ছিল না। তা আবার এনডিসি করতে ভারতে পাঠালেন। আপনি ত জানতেন জিয়া পাকিস্তানি গোয়েন্দা। তাঁকে কেন ডেপুটি চিফ করেছিলেন।

তোকে ত বলেছি, আমি মানা করেছিলাম। বঙ্গবন্ধু নিজে উদ্যোগী হয়ে তাকে উপ-সেনা প্রধান বানান। গোখরাকে দুধ কলা দিয়ে পুষলেন। ফলটাও ভোগ করলেন। আমি নির্দোষ।

স্যার, বঙ্গবন্ধুর জন্য আপনার খারাপ লাগে না।

খুব খারাপ লাগে। তার সঙ্গে আমার মতভেদ ছিল কিন্তু তাকেই বেশি শ্রদ্ধা করতাম। বাঙালি জাতির তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তার জন্যই আজ আমরা স্বাধীন। তিরিশ দশক থেকে তাকে আমি জানতাম। তিনি দশটি বছর বেঁচে থাকলে আমরা অনেক এগিয়ে যেতাম। বাংলা এবং বাঙালিকে তার চেয়ে আর কেউ বেশি ভালোবাসে না-কেউ না-(তার গলা ধরে আসে)।

স্যার, অনেকেই এখন বলছেন বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর সঙ্গে 'র'-এর একটা যোগসূত্র আছে।

আমি এখনো ঠিক জানি না। তবে বঙ্গবন্ধুকে দিল্লি সরকারের খুব ভয় ছিল। ওরা ভাবতেও পারেনি বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে আসবেন।

বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে কি দুই বঙ্গ এক হতো।

হয়ত হতো। ওপার বাংলার বাঙালিরা বঙ্গবন্ধুকে তাদের নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

সে জন্যই কি তার অকাল মৃত্যু হলো।

ইয়েস বয় ইয়েস।

স্যার, ওয়াসির নিয়োগ, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড এবং বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নেই বলে---এসব কি একই দৃষ্টিভঙ্গি ?

ইয়েস ইয়েস। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে যেসব নেতা বাঙালি সেনার জন্য পল্টনে গলা ফাটাতেন এসব নেতারাই এখন বলছে, সেনার দরকার নেই, কার সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করবো। ওদিকে আর একদল গণবাহিনীর জন্য সংগ্রাম করছে।

ওরা কি ভারতের অ্যাজেন্ট ?

সবাই না হলেও অনেকে আছেন।

মেজর জলিলের জেএসডিকে কেন জানি আমার ভালো লাগে না।

ওরা ভুল করছে। ওরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে চললে, দেশে একটা সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে উঠত। ওরাই এদেশের রাজনৈতিক পরিবেশ ঘোলাটে করেছে। আজকের অবস্থার জন্য ওরা অনেকটা দায়ী।

তাদের সমর্থনে অসংখ্য বুদ্ধিজীবী রয়েছে।

তা আছে। '৪৭ সাল থেকে এদেশের বেশির ভাগ বুদ্ধিজীবী ভাসানীর সঙ্গে ছিলেন কিন্তু তাতে দেশের কোনো মঙ্গল হয়নি। ওরা বুদ্ধি বেচে খেতে পারে কিন্তু দেশের জন্য কোনো ভালো বুদ্ধি দিতে পারেনি। ভবিষ্যতেও পারবে না। এসব বুদ্ধিজীবীর চেয়ে গ্রামে খেটে খাওয়া মানুষ অনেক ভালো। বেতন খাওয়া আর ফিস্ নেয়া বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা আর যা হোক দেশ চালানো যায় না। দেশের মঙ্গল হয় না।

তার মানে স্যার, বুদ্ধিজীবীদের টাকা দিয়ে কেনা যায়।

ইয়েস। লিয়াকতরা কিনেছে, আয়ুব খান কিনেছে, জিয়া কিনেছে। ভবিষ্যতেও অনেকে কিনবে। ফি বেশি দিলেই ওদের পাওয়া যায়।

স্যার, ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনসহ অনেকেই বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ সমর্থন করছেন।

এসব উপরতলার লোকের সঙ্গে দেশের লোকের কি সম্পর্ক ? গ্রাম বাংলা আর গ্রামবাসী গরিব দুঃখীকে যারা ভালোবাসেন তারা বাঙালি, যারা বাসেন না তারা সবাই বাংলাদেশি।

আপনি যদি নির্বাচনে জয়ী হতেন তাহলে কি জাতীয়তাবাদ বদলাতেন ?

আমাকে করতে হতো না-তারাই করতেন। তাছাড়া জোর করে বাঙালিকে বাংলাদেশি করা যায় না। পাকিস্তানির মতো এও একদিন স্মৃতির তলায় হারিয়ে যাবে। আইন করে জাতীয়তা বদলান যায় না।

স্যার, আমাদের প্রতিরক্ষা কেমন হওয়া উচিৎ?

শক্তিশালী, খুব শক্তিশালী। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী হলে দেখবে বাংলার সীমানা ঠিক হয়ে গেছে। বঙ্গোপসাগরে কোনো দস্যু থাকবে না।

বাংলার সীমানা স্যার রাওয়ালপিন্ডিতে আপনি বলতেন, বাংলা-আসাম এক হতে হবে। রাজমহল হতে আরাকান।

ও ইয়েস। আল্লাহ-তায়ালা প্রাকৃতিকভাবেই বঙ্গদেশ সৃষ্টি করেছেন, আমরা খামছাখামছি করে তা নষ্ট করেছি। দেশটার ত কোনো দোষ নেই। বেঙ্গল ইজ বেঙ্গল।

প্রাচীনকালের মতো বঙ্গদেশ খণ্ড-বিখণ্ড হয়েছে।

দেশ নয় বল দেশবাসী। বেঙ্গল রিমেইন্স বেঙ্গল।

ভারত সম্বন্ধে কিছু বলুন।

ভারতের মৌলবাদিরা খুব সক্রিয়। যে কোনো মুহূর্তে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। তার প্রতিক্রিয়া এদেশেও লাগতে পারে। আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। নইলে সিকিমের মতো হতে হবে।

বর্তমানে আমাদের সৈন্যসংখ্যা খুব কম। পাঁচশত বছর আগে স্বাধীন সুলতানদের চেয়েও নগণ্য।

হাঁ, এতো কম সৈন্য দিয়ে দেশ টিকিয়ে রাখা যাবে না। সামরিক শক্তিতে যদি আমরা দুর্বল থাকি, তাহলে ভারতের সঙ্গে কোনো সমস্যার সমাধান হবে না। তালপট্টি,

ফারাক্কা কোনোটাই ওরা মিটমাট করবে না। একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী মানেই দেশের শক্তিশালী নিরাপত্তা। এর সঙ্গে চোরাকারবারি বন্ধ করতে হবে।

স্যার, পিন্ডিতে আপনি বলেছিলেন যেদিন আমাদের দশটি ডিভিশন হবে সেদিন দুই-বাংলা এক হবে।

আমি এখনো সে আশা পোষণ করি।

স্যার, জিয়াকে আপনি মাস্টার জিয়া বলতেন।

হ্যাঁ। পাক আমলে জিয়া পাক বিরোধী ছিল। স্বাধীনতার পরেও সে মুজিব ভক্ত ছিল। কিন্তু ও কিসিঞ্জারের প্রভাবে ক্ষমতা লিপসু হয়। আর, একবার যারা ক্ষমতার লোভে পড়ে, তার ন্যায়-নীতি, হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। এটা শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী, নাজিম উদ্দিনেরও ছিল। নইলে তারা যদি সচেষ্ট হতেন তাহলে ১৯৪৭ সালের আগেই বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠিত হতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হাজার হাজার বাঙালি পাইওনিয়ার কোরে যোগদান করে।

তথাপি ব্রিটিশ সরকার বাঙালি পদাতিক বাহিনী গঠনের অনুমোদন দিলেও বেঙ্গল গভর্নমেন্টের ক্ষমতার কামড়া-কামড়িতে বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠিত হয়নি।

স্যার, নবাব সিরাজউদদৌল্লার সময় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা নিয়ে বেঙ্গল বা বঙ্গদেশ ছিল।

হ্যাঁ, ইংরেজদের সময়েও ছিল। টলেমির সময়েও বাংলা বলতে ছোটো নাগপুর, উড়িষ্যা, বিহার, নেপাল, ভুটান, বাংলা-আসাম অঞ্চলকেই বুঝাত। প্রাচীনকালে বাংলা বলতে একটি বিশাল অঞ্চল বুঝাত। আমরা বাঙালিরাই প্রাকৃতিক বাংলাকে স্বীকার করি না। শশাঙ্ককে আমাদের স্মরণ করা উচিৎ। চীন হাজার হাজার বছর পূর্বের সীমানাকে দাবি করছে। অথচ আমরা বাঙালি আমাদের নিজস্ব ভূমি ছেড়ে দিচ্ছি। What Bengal thinks today, India will think tomorrow–এর মধ্যেই বাংলার স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান।

স্যার, বাঙালির দেশপ্রেম ?

দেশ থাকলে তবে ত দেশপ্রেম। শোনো আমাদের সিলেটের এক ধরনের লোক আছে, যাদের জন্মের পর হতে বিদেশে যাবার জন্য প্ররোচিত করা হয়। তারা একসময় বিদেশে যায়-টাকা উপার্জন করে, দেশের ভালোমন্দের তাদের কিছু যায় আসে না। মাকাল ফলের মতো তাদের জীবন কাটে। সে দেশের লোকের দেশপ্রেম দেখে তাদের দেশের কথা মনে হয়। কিন্তু সেটা দেশপ্রেম নয়। একজন দেশপ্রেমিক সৈনিক দেশের জন্য যুদ্ধ করবে, যুদ্ধে প্রাণ দিবে কিন্তু পালাবে না। বঙ্গবন্ধু দেশের জন্য শত্রুর সম্মুখীন হয়েছেন বীরের মতো। শত্রু ভয়ে, মৃত্যু ভয়ে দেশ থেকে পলায়ন করেন নি। শত্রুর সঙ্গে মোকাবেলা করেছেন। এটি একটি বিরল দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত।

স্যার, ১৯৭১ এর ১৯ কি ২০ মার্চ আমার এক পাঞ্জাবি বন্ধু হাবিলদার শের খান আমাকে বলেছিলেন, জাপানি ২টি জাহাজ ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আসছিল। যা পাকিস্তান নৌবাহিনী ধরে ফেলে এবং করাচি নিয়ে যায়। পরে কোহিস্তান পেপারে এমনই একটা সংবাদ পড়েছিলাম।

হ্যাঁ। সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য আমাদের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল। বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রাক্তন সৈনিকদের দ্বারা সামরিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছিল। ঐ অস্ত্র আমাদের হাতে পড়লে একাত্তরের ইতিহাস অন্যরকম হতো।

অস্ত্রগুলি পাকবাহিনীর হাতে গেল কিভাবে ?

সেটা বলা মুশকিল। তবে এমন হতে পারে আমাদের মধ্যে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অথবা সে বন্ধু রাষ্ট্রটিও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে।

আপনার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী লে. কর্নেল এ এস এম মোস্তাফিজুর রহমান আপনাকে কটাক্ষ করে বলেছেন যে, আপনি নাকি মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতায় নেশায় বিভোর হয়ে থাকতেন, মুক্তিযুদ্ধে আপনার তেমন অবদান নেই।

ওরা বলতে পারে। ওরা ত পাকিস্তানে বসেছিল। তাছাড়া সেতো ওদের দালাল। ৬৪/৬৫ নির্বাচনে আয়ুবের দালালি করেছে। ৬৭-৬৯ আগরতলা মামলায় মিরজাফরি করেছে। মুক্তিযুদ্ধের সঠিক মূল্যায়ন ইতিহাসই একদিন আপন গতিতে করবে।

স্যার, আমরা যতদূর জানি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের জনক বলা হচ্ছে মেজর আবদুল গণিকে।

তা ঠিকই বলা হচ্ছে, আমি ত বেঙ্গল রেজিমেন্ট নামকরণ প্রস্তাব করেছিলাম। যারা ইস্ট বেঙ্গল নামকরণ সমর্থন করেছিলেন তার মধ্যে মেজর আবদুল গণি অগ্রগণ্য ছিল। তবে সত্যিকার অর্থে বললে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের জনক তার প্রথম অধিনায়ক। কর্নেল ডিজেই পিটারসন। কারণ তাঁর নেতৃত্বেই প্রথম, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সংগঠিত হয়। ঐ ইংরেজ অফিসারটি বাঙালিদের সত্যিকার ভাবেই ভালোবেসেছিলেন এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠনে অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঐ মহান ব্যক্তিটিকে আমাদের স্মরণ করা উচিৎ। বিদেশি বলে তাকে ভুলে যাওয়া উচিৎ নয়।

আপনার সঙ্গে একমত। স্যার, আ স ম আবদুর রব-সহ অনেক মুক্তিযোদ্ধা এখন বঙ্গবন্ধু না বলে শেখ মুজিব বলছেন।

দেখ রহমান, সংসদে আমি বারবার বলেছি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা পরিকল্পিতভাবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান করেছেন। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ এর পরে যারা এটা মানে না, কিংবা বঙ্গবন্ধু বলে না, তাদের জন্য বলা ভালো : ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। তারা মনে প্রাণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা মানে না।

এবার ওসমানী সাহেব বলে উঠলেন : তোমার মেয়ে জেগেছে রহমান, ওরে খাইয়ে নিয়ে যাবে। আমি এখন ক্লাবে যাব।

ডিসেম্বর
১৯৮১

ঢাকা থেকে বদলি যাবার আগে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তাঁকে খুব ক্লান্ত মনে হলো। আমি তাঁকে রাজনীতি ছেড়ে বিশ্রাম নিতে বললাম। ম্লান

হেসে বললেন, আমিও তাই চেয়েছিলাম। বঙ্গবন্ধুর জন্য রাজনীতিতে আসতে হলো। রাজনীতি খারাপ না। এটাও একটা মহৎ পেশা। আয়ুব খান, জিয়া লোকজনের মনে রাজনীতির এবং রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে সুকৌশলে প্রচারণা চালিয়েছে। ফলে লোকজন বিভ্রান্ত হয়েছেন। তবে সত্য একদিন প্রকাশ পাবেই। এসব সামরিক নেতারা একদিন আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপিত হবে। যেমন আয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান হয়েছে। ইতিহাসের ধারা কেউ বদলাতে পারেনি। এরাও পারবে না।

স্যার, মেজর জেনারেল এম আই করিম একাত্তরে বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রবিদ্রোহী মামলায় চেয়ারম্যান ছিলেন। দেশ স্বাধীন হলে বাংলাদেশে আসেন। আমিও তাঁর সঙ্গে একই প্লেনে আসি। মনে আছে আকাশে তিনি একবার বলেছিলেন, না খেয়ে থাকবো, তবুও স্বাধীন বাংলায় মরবো। আমরা এখন স্বাধীন। বাঙালিদের এর চেয়ে বড়ো পাওয়া আর কিছু হতে পারে না। তার কথাগুলো আমাদের খুব ভালো লেগেছিল। বঙ্গবন্ধু তাঁকে পুনর্বাসন করেন। শুনেছি তিনি এখন কোটিপতি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তিনিও জড়িত ছিলেন। জেনারেল করিম সম্বন্ধে কিছু বলুন।

একজন সৈনিক হলেন দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক। সেনাপতি মিরজাফর দেশ-প্রেমিক ছিলেন না। জেনারেল করিমকে আমি ভালোভাবে জানি। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর জড়িত হবার প্রশ্ন ওঠে না। সিরাজউদদৌলাকে হত্যাকারী জেনারেলদের যেমন ইতিহাস যুগ যুগ ধরে ঘৃণা করে এসেছে, এদেরও তাই করবে।

বঙ্গবন্ধুর হত্যার সঙ্গে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত সরাসরি জড়িত ছিলেন।

জানি।

জানেন তো তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন না কেন। অনেকদিন তো হলো। উনি চুপ থাকলেন। আমি আবার বললাম—আর্মি পুনর্গঠন না করে যেমন আপনি আর্মি ছেড়ে দেন। আবার বঙ্গবন্ধুর হত্যার পরেও সক্রিয় বিরোধিতা করেননি। আমরা খুব দুঃখ পেয়েছি।

কথাটা ঠিক নয়। সরকার আমাকে আর্মিতে রাখেনি। জিয়া-শিশু গং আমাকে সড়ানোর জন্য অ্যাকটিভ ছিল। শেখ মনি, তোফায়েল, আসম আবদুর রব, প্রমুখ যেমন তাজউদ্দিনের পিছনে লেগেছিল, ঠিক তেমনি। মুজিবনগরে ঘাপটি মারা, তাজউদ্দিনের বিরোধিরা আর মুজিববাহিনীর নেতারা বঙ্গবন্ধুর নিকট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মোশতাক যে ভালো নয় তা বঙ্গবন্ধু জানতেন। কিন্তু সিআইএ তাজ বিরোধীদের কাজে লাগায়। আমার কথায় কোনো গুরুত্ব দেননি বঙ্গবন্ধু। ওরা মোশতাক-জিয়া গংকে বঙ্গবন্ধুর নিকট গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিল। জিয়া-মোশতাক-বোস্টারের কর্মকাণ্ডের কথা বঙ্গবন্ধুকে অবহিত করেছি। কেবল এ-কারণেই কোনো কাজ হয়নি। জিয়ার নেটওয়ার্ক ছিল খুব সুদৃঢ়। এমআই, ডিজিএফআই, এনএসআই এরা সব বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে যায়। বঙ্গবন্ধুর অনেক সিদ্ধান্ত এরা কার্যকর করতে দেয়নি। বঙ্গবন্ধুর হত্যার প্রতিবাদ করেছি। দেশবাসী তার গুরুত্ব দেয়নি। জিয়া গং যে আমাকে হত্যা করেনি এটাই তো মিরাকল।

স্যার, দেশ স্বাধীন হলো, আর সব সিনিয়র অফিসার বিদায় হলো, এ যে কত বেদনাদায়ক, ভাবতেও পারা যায় না।

এ সিদ্ধান্তটাই মারাত্মক ভুল ছিল। সিনিয়র অফিসাররা থাকলে, এ ঘটনাগুলো হতে পারতো না। জিয়া ক্ষমতায় বসতে পারতো না। তবে সে দেশপ্রেমিক।

স্যার, আপনি অনেকবার বলেছেন যে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা এবং সাহিত্যিক যারা সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সমাজে বিখ্যাত, তারা বাংলা ভাষা এবং স্বাধীনতা বিরোধী ছিলেন। বিষয়টা খোলাসা করে বলবেন ?

এটা না বুঝবার কারণ দেখি না। ভাষা আন্দোলনের কথা ধরো। ৫০-দশকে মৌলানা আকরাম খাঁ, প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁর তো বিখ্যাত ব্যক্তিরাও জাতীয় সংসদে রাষ্ট ভাষার দাবি উত্থাপিত হলে উর্দুর পক্ষে মত দেন। শ্রদ্ধেয় ধীরেন দত্ত এবং কংগ্রেস পার্টির সদস্যরাই শুধু বাংলা ভাষার পক্ষে সমর্থন দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে স্বাধীনতা সংগ্রামকে নূরুল আমীন, শাহ আজীজ, হামিদুল হক চৌধুরীসহ অসংখ্য নেতা ও বুদ্ধিজীবী সমর্থন করেন নি। কারণ এসব নেতা ও বুদ্ধিজীবী নিজেদের বলয় থেকে বের হতে চাইতেন না। **ইংরেজি ছাড়াও চলা যেতে পারে আবার স্বাধীন হয়েও টিকে থাকা যায়- এ কথা তাদের মাথায় আসতো না। তারা ভাবতেন ইংরেজি ছাড়া চলবে কি করে?** আবার ছোটো একটি দেশ স্বাধীন হলে টিকবে না। তাই তারা বাংলা ভাষার বিরোধিতা করেছেন, স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছেন। তারা শুধু নিজেদের স্বার্থের কথা ভাবতেন, দেশবাসীর কথা ভাবতেন না। পাকিস্তানিরা যে বাঙালিকে স্বাধীন জাতির মর্যাদা দিচ্ছে না তা তারা বুঝতো না।

স্যার, আসগর খান-ওয়ালী খান প্রমুখ কিন্তু বাঙালিদের সম্মান দেন।

কারণ তারা পাকিস্তানি নন। পাঞ্জাবিও নন। পাকিস্তানি মানেই পাঞ্জাবি আর মহাজের। সিন্ধু, বেলুচিস্তান-সীমান্ত প্রদেশ নয়। সেই জন্য ওরা পাকিস্তানিদের গোলাম। আমাদের মতো ওরাও একদিন স্বাধীন হবে।

স্যার, একটি বিষয়ে আবার সমস্যা হচ্ছে। সম্প্রতি জেনারেল এরশাদ বার বার বলছেন বঙ্গবীর ওসমানী মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। কিছুদিন আগে আমি কমান্ডার-ইন-চিফ এবং সুপ্রিম কমান্ডার এর বাংলা প্রতিশব্দ এবং মুক্তিযুদ্ধের নিয়োগ দানের একটা নোট সুপ্রিম হেডকোয়ার্টারে দিয়েছিলাম। এভাবে বললে তো ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হবে, ইতিহাস বিকৃতি হবে।

আমিই ত মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলাম।

কিন্তু আপনি বলেছেন ১৯৭১ এ মুক্তিবাহিনীর নামই বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী (Bangladesh Armed Forces)।

হ্যাঁ, যুদ্ধের কারণে আমরা মুক্তিবাহিনী বলতাম। প্রচার মাধ্যমও তাই বলতো।

সরকারি কাগজপত্রে আপনার নিয়োগ C-in-C Bangladesh Armed Forces কিন্তু চিঠিপত্র C-in-C.

বাংলাদেশ ফোর্সেস আবার Headquarter Bangladesh Forces উল্লেখ আছে।

তখন বাংলাদেশ আর্মড ফোর্সেস-কে সংক্ষেপে আমরা BD Forces বলেছি। আমিই সর্বাধিনায়ক ছিলাম।

স্যার, Declaration of Independence এ প্রেসিডেন্টকে সুপ্রিম কমান্ডার বলা হয়েছে। বর্তমান সংবিধানেও রাষ্ট্রপতিকে সুপ্রিম কমান্ডার বলা হয়েছে।

সমস্যা কি ?

স্যার সমস্যা হলো ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মিতে C-in-C সর্বাধিনায়ক ছিলেন কিন্তু বর্তমানে C-in-C কে প্রধান সেনাপতি বলা হয় এবং সুপ্রিম কমান্ডার-কে সর্বাধিনায়ক বলা হয়।

নো নো তখন আমি মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলাম, সশস্ত্রবাহিনীরও সর্বাধিনায়ক ছিলাম।

তাহলে স্যার, সুপ্রিম কমান্ডার রাষ্ট্রপতিকে বাংলায় কি বলবো ?

সশস্ত্রবাহিনীর প্রধান । তাহলে কি সমস্যা হয় ?

অবশ্যই স্যার। চিফ এবং সুপ্রিম এক নয়। চিফ এর প্রতিশব্দ প্রধান, সুপ্রিম-এর প্রতিশব্দ শ্রেষ্ঠ বা সর্বাধিক। আয়ুব খান কমান্ডার ইন চিফ ছিলেন, পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা। আপনার নিয়োগ পত্র অনুযায়ী আপনি কমান্ডার ইন চিফ, বাংলাদেশ ফোর্সেস অর্থাৎ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতি কিন্তু বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক রাষ্ট্রপতি।

বুঝতে পেরেছি। উনি চুপ করলেন। তাঁকে আর প্রশ্ন করতে সাহস পেলাম না। মনে হচ্ছিল উনি খুব বিরক্ত হয়েছেন। পরে দেখেছি, ১২ এপ্রিল, ১৯৭২ থেকে তাঁকে Commander-in-Chief of the Armed Forces of Bangladesh করা হয়েছে। তাঁর ডুসিআরে আছে। "সি-ইন-সি বাংলাদেশ আর্মড ফোর্সেস।"

স্যার, আজ আপনাকে আমি শেষ বারের মতো অনুরোধ করছি, মেজর সিদ্দিক বলেছে, মার্কিনীরা কখনোই বাংলাদেশের স্বাধীনতা পক্ষ শক্তিকে সরকার গঠন করতে দিবে না। মেজর জামাল একই কথা বলে এবং এ জন্য আপনাকে সোচ্চার হতে অনুরোধ করেছে।

চেষ্টা তো করছি। কিন্তু জনগণকে বুঝাতে পারছি কৈ? বাড়ি-ঘর বিক্রি করে আমেরিকা যাবার জন্য এদেশের মানুষ সর্বশান্ত হচ্ছে। তাদের তুমি বুঝাবে কিভাবে? তুই হাসিনা-কামালকে গিয়ে বল।

কতক্ষণ তার প্রতি চেয়ে থেকে সালাম দিয়ে চলে এলাম।

আগস্ট
১৯৮২

আমার স্ত্রীর প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা উঠাতে ঢাকা এলাম। বগুড়ার দৈ এবং সন্দেশ বঙ্গবীর ওসমানীর বাসায় দিলাম। তিনি ছিলেন না। ব্যাটমানকে বললাম, কাজে এসেছি। দুপুরে এসে দেখা করে যাব। এজিবিতে কাজ শেষ করতে একটা বেজে গেল। সেখানেই খেয়ে বনানি ডিওএইচএস এলাম। উনি খেয়ে বিশ্রাম করছিলেন। একেবারে শয়নকক্ষে গেলাম। সালাম দিতেই বললেন, তুই এখন মেজর না কর্নেল। বললামঃ মেজর। টিভিতে দেখলাম আপনি অসুস্থ। বিদেশে গিয়ে একবার চেক-আপ করে আসুন না।

যাব যাব। দৈ খেয়েছি। বল ওখানে কেমন লাগছে?

খুবই ভালো, নিজ জেলায় সেনানিবাস। তবে স্যার, নর্থ-বেঙ্গলে আপনার কোনো স্মৃতি চিহ্ন নেই। বগুড়াতে আপনার নামে একটা মহিলা ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য কমান্ড্যান্টের মাধ্যমে প্রস্তাব পেশ করেছি।

আমার নামে, তোর জেলায়, ভুল করেছিস, ওরা কোনো দিন হতে দিবে না। ওখানে জিওসি কে ?

জেনারেল সালাম, স্যার। প্রচণ্ড পরিশ্রমী কমান্ডার। স্যার, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্য ও কর্তব্য কি হওয়া উচিৎ ?

এটা তুই বল ।

তার কথায় আমি থতমত খেয়ে গেলাম। তাঁর মুখের প্রতি চেয়ে রইলাম। তারপর সাহস করে বললাম, "মহারাজ শশাঙ্ক যে বাংলা প্রতিষ্ঠা করেন, এমন কি সম্রাট বাবরের সময়ে যে বাংলা ছিল, তা উদ্ধার করা। রাজমহলের পাহাড় চূড়ায়, আন্দামান নিকোবর, আরাকান, করিমগঞ্জ, গোয়ালপাড়া, কাছার আর ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ান। দার্জিলিং-এ রাষ্ট্র প্রধানের গ্রীস্মকালীন রাজধানী করা। চাঁদে বাঙালির অভিযান চালান। গঙ্গার প্রবাহ ফিরিয়ে নেওয়া, আসামে বাঙালি নিধন বন্ধ করা এবং মুজিবনগরে মহাবঙ্গের রাজধানী স্থাপন করা।

এ পাগল, এসব কি সেনাবাহিনীর কর্তব্য? এগুলো রাজনৈতিকদের। সেনাবাহিনীর না ।

স্যার, সেনাবাহিনীকে দিয়েই এসব করতে হবে।

এসব মধ্যযুগীয় ধারণা। সম্ভব না। তবে রাজনৈতিকভাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলে সবটা না হলেও দুই বাংলা এক হতে পারে।

সেদিন পেপারে দেখলাম আপনি বলেছেন স্বাধীনতার ঘোষণা বঙ্গবন্ধুই দিয়েছেন। ঘোষণার ব্যবস্থা আপনি করেছেন। কিন্তু এ কথা কেউই বিশ্বাস করছেন না।

হ্যাঁ, স্বাধীনতার ঘোষণা আমরা আগেই ব্যবস্থা করেছিলাম। অমি, তাজ, বঙ্গবন্ধু।

স্যার, স্বাধীনতা ঘোষণার ব্যাপারে একটি পুস্তিকা আকারে লিখে বিতরণ করার ব্যবস্থা করুন। নইলে এ নিয়ে ভবিষ্যতে একটা হেনস্তা হতে হবে।

মুজিবনগর সরকার Declaration of Independence-এ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বাংলা-ইংরেজিতে পুস্তিকা আকারে সারা বিশ্বে প্রচার করা হয়েছে।

ঐ লিফলেট আমরা রাওয়ালপিন্ডিতে একাত্তরেই দেখেছি। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার কথা উল্লেখ তাতে আছে কিন্তু ঘোষণাপত্র নেই। তার সঙ্গে যদি ঘোষণাপত্র থাকতো তাহলে আজ এ সমস্যা হতো না। বর্তমানে খোদ স্বাধীনতা পক্ষের লোকেরাই স্বাধীনতার ঘোষণা বার্তার বিভিন্ন ভাষ্য দিচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা বার্তা মুজিবনগর সরকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিশ্বজুড়ে ব্যাপকভাবে প্রচার করেছে। সে রেকর্ড তো মজুদ আছে। ২৫/২৬ মার্চ, ১৯৭১ প্রথমে বঙ্গবন্ধু প্রতিরোধ নির্দেশ দেন; দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার ঘোষণাবার্তা প্রচার করা হয় এবং তৃতীয়ত, বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য বার্তা পাঠান।

শোন, স্বাধীনতার ঘোষণাবার্তার খসড়া আমিই করেছিলাম। অধ্যাপক ড. মাজহারুল ইসলাম আমাকে সাহায্য করেছিলেন। তাজউদ্দিনের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু তা সংশোধন করে দেন। ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ সন্ধ্যায় উহা হাইকমান্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। আমি একজন অপারেটরকে দিয়ে তা রেকর্ড করিয়ে নিই এবং একটি অয়ারলেস সেট আগেই যোগাড় করা হয়েছিল। পাকবাহিনী সে-দিন রাতে অভিযান শুরু মাত্র সেই অপারেটর বলদা গার্ডেন থেকে প্রচার করে। এ-ছাড়া স্বাধীনতা ঘোষণাবার্তার কয়েকটি কপি আমি ঢাকা সেন্ট্রাল অয়ারলেস কেন্দ্রে, ইপিআর পিলখানার সিগন্যাল সেন্টারে প্রচারের জন্য পাঠিয়েছিলাম। পুলিশ অয়ারলেস কেন্দ্রেও পাঠিয়েছিলাম। এসব অয়ারলেস কেন্দ্র থেকে ছেলেরা সারাদেশে উহা প্রচার করতে সক্ষম হয়। অধিকাংশ জেলা-মহকুমা এবং অনেক থানাতে স্বাধীনতার ঘোষণা বার্তা পৌঁছে যায়। ডিসি, এসপিসহ বহু রাজনৈতিক ব্যক্তি তা জানতে পারেন কিন্তু সে সময় পাকবাহিনীর মুভমেন্ট হওয়ায় এবং তাদের নৃশংস অভিযানের ফলে এসব আমলা যারা কিনা পাকিস্তান ভক্ত ছিল, তারা বার্তাটির গুরুত্ব দেয়নি। তারা মনে করেছিল পাকবাহিনী ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করবে। স্বাধীনতা উত্তর এসব আমলা জিয়ার খপ্পড়ে পড়ে। লোভলালসা মানুষকে নীতিহীন করে। এরাও হয়েছে।

স্যার, প্রেসিডেন্ট জিয়া ভারত সফরে গেলে রাষ্ট্রপতি রেড্ডি তাঁকে স্বাধীনতার ঘোষক বলে তাঁর প্রশংসা করেছেন।

ওরাই তো আমাদের ডুবাচ্ছেন। স্বাধীনতার ঘোষণাবার্তা যেমন পাকিস্তান সিগন্যাল ধারণ করে ঠিক তেমনি বিদেশি কূটনীতিকদের উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন অয়ারলেসে ধরা পড়ে। তারা তাদের সরকারকে তা তখনই জানিয়ে দেন। ভারত, রাশিয়া, আমেরিকা সব সরকারই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা বার্তা অবগত হন।

সংবাদ মাধ্যমগুলো তা ব্যাপকভাবে প্রচারও করেছে। তারা আবার জিয়াকে ঘোষক বানাচ্ছে কেন? ওদের মতলবটা কি ?

স্যার, ভারতের মতলবটা তো আমার নিকট পরিষ্কার।

ওরা বাংলাদেশকে রাজ্য বলেছে। ওরা প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছে। স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে রাজ্যপাল বলেছে। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতিকে সর্বাধিনায়ক বলেছে। ওরা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে বাংলাদেশি প্রস্তাব করেছে, জিয়াউর রহমান তা লুফে নিয়েছে। এখন তারা জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার পাঠক থেকে ঘোষক করেছে।

ওদের কথা বাদ দাও। আওয়ামী লীগ নেতারা কি কখনো বলেছে, স্বাধীনতার ঘোষণার ব্যবস্থা আমি করেছি। ওরা তা তো বলছে না তার উপর একেক জন একেক রকম বিবৃতি দিচ্ছেন। এরাই তো গোলমাল করছেন। আর সে সুযোগ নিচ্ছে শত্রুরা। ঘোষণাটা তো পরিকল্পনা মোতাবেকই দেওয়া হয়। হাইকমান্ডের সব নেতা অনুমোদনের সময় ছিলেন। এখন এরা যেমন আমাকে হাইড করছে তেমনি হান্নান সাহেবের ঘোষণাকে গুরুত্ব দেয়নি। **বঙ্গবন্ধুর প্রতিরোধ নির্দেশকে আবার অনেকে স্বাধীনতার ঘোষণা বলছে।** অনেকে তো তা আবার বইয়ে উল্লেখও করেছেন। গুরুত্বটা কেউ উপলব্ধি করছে না।

স্যার, আপনাকে বলেছি, আমি নিজে ২৯শে মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তান জিএইচকিউ মিলিটারি অপারেশনস পরিদপ্তরে স্বাধীনতার ঘোষণার আংশিক টেপ রেকর্ড শুনেছি। তা আমি তখনই মেজর খালেদসহ অনেককে বলেছি। তাছাড়া ২৬শে মার্চ ১৯৭১ সকালেই জিএইচকিউ অফিসে পাঞ্জাবিদের মুখে বলতে শুনেছি। শেখ মুজিব ইস্ট পাকিস্তানকো আলাগ স্টেট অ্যালান কর দেয়া, ও গাদ্দার হ্যায়, উসকো ফাঁস মে লটকাও। **এমন কি** মিলিটারি অপারেশনস পরিদপ্তরের **আফজালকে বোধ হয় আপনি চিনেন, সেও আমাকে বলেছে, সেদিন রাতে আড়াইটা থেকে তিনটার মধ্যে ঢাকা থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা বার্তা পাক সিগন্যালে ধরা পড়ে তা তারা পিন্ডি পাঠায়।** এসব কথা বিস্তারিত লিখে এখানে দিয়ে গেছি।

পেয়েছি। মনে হচ্ছে রেকর্ড করাটাই শুনেছ।

সুপারেনটেন-এর ঘরের পাশে হার্ড বোর্ডের পার্টিশন দেওয়া ঘরে ওরা আলাপরত ছিল। সেটে ঘর ঘর শব্দ হচ্ছিল, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ ছিল। তাই ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। পরে গুজরাটের হাবিলদার শের খান বলেছিল, বঙ্গবন্ধু খুব চালাক, নিজে ঘোষণা না দিয়ে অপারেটরকে দিয়ে করিয়েছে। এটা রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার দলিল হিসেবে ব্যবহার হবে।

ঠিকই বলেছে। ঐ অপারেটরের কণ্ঠস্বর অনেকটা বঙ্গবন্ধুর মতো ছিল। তবে ওরা বোধ হয় বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাবার্তা এবং স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের আহবান-বার্তা - এ-দুটিই টেপ থেকে বাজিয়েছিল।

স্যার, যেভাবে প্রচারণা চলছে এবং লোকজন বলাবলি করছে এটা তো একটা মুসিবত হবে। একটা কিছু এখনই করেন।

ওরা শত চেষ্টা করলেও ইতিহাস বিকৃত করতে পারবে না। একটা ব্যাপার হচ্ছে, জিয়ার বেতার ঘোষণা চট্টগ্রাম এলাকার বহুলোক শুনেছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় তা আবার আমরা ব্যাপকভাবে প্রচার করেছি। তাকে স্বাধীনতার ঘোষক বলার জন্য নয়- দেশবাসী তথা মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য। এটা নিয়ে এতো হৈ চৈ করার কি আছে?

এটা এ জন্য যে এদের দাবি জিয়ার ডাকেই লোক মুক্তিযুদ্ধে গেছে, যুদ্ধ করেছে, বঙ্গবন্ধুকে এরা মানে না।

কিছুদিন পর এসব হৈ চৈ বন্ধ হয়ে যাবে। এরশাদ একটা শয়তান তাই এদের লিফট দিচ্ছে। টেপটা অথবা খসড়া উদ্ধার করতে পারলে বড়ো ভালো হতো। **খসড়াতে বঙ্গবন্ধুর অনুস্বাক্ষর রয়েছে।**

স্যার, আমরা কিন্তু পাকিস্তানে জানতে পারি যে জিয়া বিদ্রোহ করেছে। রেডিওতে ভাষণ দিয়েছে। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিয়েছে এবং পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। জিএইচকিউ-তে ভীষণ হৈ চৈ পড়েছিল। পিওন, চাপরাশি, সৈন্যরা গালি-গালাজ করতো। আবার অনেকে হাসাহাসিও করতো।

দেখ, জিয়া বিদ্রোহ করেছে, যুদ্ধে যোগদান করেছে। এটা তো আমরাই যুদ্ধ কৌশল হিসেবে প্রচার করেছি।

স্যার, পাকিস্তান ক্যাম্পে থাকতে ঢাকা বেতার থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনেছি। বঙ্গবন্ধু বললেন, "আমি অয়ারলেসে চট্টগ্রামে জানালাম, বাংলাদেশ আজ থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম।

আমার খসড়াতে স্বাধীন ও সার্বভৌম ছিল। তাজউদ্দিনের পরমর্শে বঙ্গবন্ধু উহা বাদ দেন। বঙ্গবন্ধু সভরেন বাদ দিয়ে বললেন, ওদের দখলদারিত্ব যতদিন আছে, সভরেন ব্যবহার ঠিক হবে না। উনি বোধ হয় সে-কথা ভুলে যান। তা-ছাড়া রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বার্তাটি পৌঁছে দিবার ব্যবস্থা বঙ্গবন্ধু নিজে নিয়েছিলেন। তবে দিতে পারেননি । ওয়ারলেসে যে ঘোষণা হয়েছে সেটাই হয়ত বুঝিয়েছিলেন।

স্যার, আমি মেজর জলিলের নাম কয়েকবার বিবিসি থেকে শুনেছি।

হ্যাঁ, তারা অনেক অপারেশন করেছিলেন। সে থাক, তুমি যে ঘোষণা শুনেছ সেটা বলাবলি করো না-এরা তোমায় মেরে ফেলতে পারে।

স্যার, জিয়াকে স্বাধীনতার ঘোষক না বলে বিদ্রোহী জিয়া বললেই ভালো হয়। কারণ, তিনিই একমাত্র সামরিক অফিসার যিনি প্রথমে বিদ্রোহ করেন।

একদিন সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। একটা ব্যাটালিয়ান নিয়ে জিয়াই প্রথমে বিদ্রোহ করেন এবং বেতারে ঘোষণা দিয়েছেন। যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। এজন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী ছিল। এরা আমার মতো জিয়াকেও মূল্যায়ন করে না।

স্যার, এ-সবের বিরুদ্ধে আপনাকে সংগ্রাম করতে হবে। নইলে ইতিহাস বিকৃত হবে। (বঙ্গবীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবং অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললেন) শুধুমাত্র স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেই একটা দেশ স্বাধীন হয় না। তাহলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কুর্দীরা তাদের জাতির জন্য যুদ্ধ করছে, স্বাধীন হতে পারছে না। কাশ্মীরিরা কয়েক যুগ ধরে যুদ্ধ করছে, ফিলিস্তিনিরা, ফিলিপাইনের মোরো মুসলমান, বর্মার আরাকানিরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে। স্বাধীন হতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার জন্য ১৯৪৭ সাল থেকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়েছেন, প্রস্তুত করেছেন, এবং ১লা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ ১৯৭১ ইস্ট পাকিস্তানকে স্বাধীন বাংলাদেশে রূপান্তরিত করেছেন। এ-সময়ে এ-দেশে পাকিস্তানের কোনো শাসন ছিল না। বলা যায় পাকিস্তানিরা স্বাধীন বাংলাদেশকেই ২৬ শে মার্চ ১৯৭১ দখল করলে বাঙালিরা নয় মাস যুদ্ধ করে সেই স্বাধীন রাষ্ট্রকে মুক্ত করে।

এ-জন্য তখন তারা স্বাধীনতার ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করেনি। যদিও বঙ্গবন্ধু ২৫ শে মার্চ ১৯৭১ সন্ধ্যায় পাকবাহিনীকে প্রতিরোধের নির্দেশ দিয়েছিলেন, হাই কমান্ড কর্তৃক অনুমোদিত স্বাধীনতার ঘোষণা বেতারে প্রচারিত হয়েছিল এবং স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার আহবান করেছিলেন। পাক আক্রমণে সারা দেশে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। তারপরও জনগণের প্রত্যাশা মোতাবেক আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার বাণী স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে সন্নিবেশপূর্বক প্রচার করেছি। এটা দুনিয়ার সবাই জানে। তাই জিয়া কখনো স্বাধীনতার ঘোষক নয়। পরিকল্পিতভাবে বঙ্গবন্ধুর নামেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছে। সে-ব্যবস্থা আমিই করেছিলাম। সংসদে আমি একাধিকবার বলেছি বঙ্গবন্ধুই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। আমরা না শুনলেও ভারতসহ অনেক রাষ্ট্র তা শুনেছে, জেনেছে। তাই এ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। স্বাধীনতা ঘোষণা দিবার মতো উপযুক্ততাও তখন তার ছিল না। আর সে দায়িত্ব বহন করার ক্ষমতাও জিয়ার ছিল না। সে জন্যই তার বেতার ভাষণের পর পরই বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। জনগণের চাপে তার ভাষণের সংশোধন প্রচার করতে হয়েছিল। চট্টগ্রাম সংগ্রাম পরিষদের কর্তৃত্ব মেনে নিতে হয়েছিল। বড়ো কথা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাবার্তা জিয়ার বেতার বিবৃতির পূর্বে ভারত-সহ বিশ্বজুড়ে ব্যাপকভাবে প্রচার পাওয়ায় জিয়া এবং বেতার শিল্পী/কর্মীদের যুদ্ধের প্রচারণামূলক বিবৃতির কারণে তা গ্রহণযোগ্য হয়নি। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাবার্তা ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও আলোচিত হয়েছে।

স্যার, তাহলে বঙ্গবন্ধুর প্রতিরোধ নির্দেশকে আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা বলতে পারি।

না, পাকবাহিনীর আক্রমণের পূর্বে সন্ধ্যার পর পরই বঙ্গবন্ধু পাকবাহিনীকে প্রতিরোধের নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রতিরোধ-নির্দেশকে স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা বলা যাবে না। বঙ্গবন্ধুর প্রতিরোধ নির্দেশে তেমন শব্দ চয়নও নেই। বরং জিয়ার ভাষণে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মতোই স্বাধীনতার যুদ্ধের ঘোষণা স্পষ্ট এবং

সেজন্যই জিয়া সংবিধানের প্রস্তাবনায় সংশোধন করে স্বাধীনতার ঘোষণার স্থলে স্বাধীনতার যুদ্ধের ঘোষণা সন্নিবেশিত করেন। তখন কেউ তার প্রতিবাদ করেনি। বিষয়টা এরূপ দাঁড়ায়, ২৭ শে মার্চ ১৯৭১ জিয়া স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদানের ঘোষণা দিয়েছে। ৩০ শে মার্চ ১৯৭১ চট্টগ্রাম সংগ্রাম পরিষদের খসড়া অনুযায়ী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছে। দুটোই বঙ্গবন্ধুর পক্ষে দিয়েছে। মাঝখানে ২৮ ও ২৯ মার্চ ১৯৭১ স্বাধীন বাংলা বেতার শিল্পীরা এবং ক্যাপ্টেন শমসের মোবিন ও ক্যাপ্টেন এএসএম সুবিদ আলী ভূইয়া যুদ্ধের কৌশলগত কারণে অনেক কিছু বলেছেন। সে-সবের সঙ্গে জিয়ার বক্তব্যের তারতম্য রয়েছে। তবে সে-সব উত্তেজনাপূর্ণ বক্তব্য আমাদিগকে আলৌকিক শক্তি যুগিয়েছে। তাদেরও মূল্যায়ন হওয়া উচিৎ। জিয়ার প্রথম ভাষণের জন্য বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল কারণ ১লা মার্চ থেকে মুক্তি আন্দোলন কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হয়েছিল।

কিন্তু তিনি নিজেকে সেনাপ্রধান, রাষ্ট্রপ্রধান ঘোষণা করায় চট্টগ্রাম এলাকায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। সে জন্য সংগ্রাম পরিষদ তাঁর ভাষণের সংশোধন করে দিয়েছিল। জিয়া সংশোধিত বিবৃতি পাঠ করায় ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটেছিল। ১৯৭৫-উত্তর স্বার্থান্বেষীরা উহাকে গুবলেট বানাচ্ছে ।

কালুরঘাট বেতার থেকে ২৬ শে মার্চ ১৯৭১ এম এ হান্নান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার যেমন সত্য, জিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদানের ঘোষণাও ঠিক তেমনি সত্য।

স্যার, আপনি বলেছেন জিয়া একাত্তরে যুদ্ধে যোগদানের ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং সে জন্যই সংবিধানের "প্রস্তাবনায় সংশোধন করে স্বাধীনতার ঘোষণার স্থলে স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা সন্নিবেশিত করেন। আমি সংবিধান পর্যালোচনা করেছি। জিয়ার এ-কাজটি খুবই গর্হিত অপরাধ ছিল। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়ার জন্যই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, জিয়া একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করলে এবং বেতার ঘোষণা না দিলেও, মুক্তিযুদ্ধের কোনোপ্রকার ব্যত্যয় ঘটতো না। যে-ভাবে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে সে ভাবেই হতো।

ইয়েস। তবে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদানের ঘোষণা।

- তাহলে স্যার, সংবিধানের প্রস্তাবনায় আবার নিম্নরূপ সংশোধন করতে হবে।

"আমরা বাংলাদেশের জনগণ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে ২৬ তারিখে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার আলোকে জাতীয় মুক্তির জন্য মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।"

অতঃপর সংবিধানেই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি একটি পরিশিষ্ট হিসাবে সন্নিবেশিত করতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধানের কপি সব স্কুল-কলেজ, অফিস-

আদালতে সরবরাহ করতে হবে এবং স্কুল-কলেজের পাঠ্য বই-পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

বাঃ বেশ প্রস্তাব তো দেখি। সংবিধান সংশোধন করা চাট্টিখানি কথা। তুই সংবিধান বিশেষজ্ঞ হলে কবে, এ্যা?

ল কলেজে ভর্তি হয়েই মূল সংবিধান মুখস্ত করে ফেলি।

ল কলেজে পড়লি কবে ?

পাকিস্তান থেকে এসেই ধানমন্ডি ল কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। স্যার, আপনি রাজনীতি করায় সেনাবহিনীর সদস্যরা ভালো মনে করে না। এখন বাদ দিন না।

দেখ বেটা, রাজনীতি সব মানুষই কম বেশি করে। সরকারি কর্মচারীরা কাজ ফেলে সারাদিন রাজনীতি করে। সেনাবাহিনীর সদস্যরাও করে। প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে। যে দেশের মানুষ যত বেশি রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন হবে, সে-দেশের শাসনব্যবস্থা ততো ভালো হবে। তবে কাজ ফেলে টেবিলে বসে রাজনীতি করা নয়। জিয়া রাজনীতি করলো, সৈন্যরা বাহবা দিল, কিন্তু ওরা বুঝলো না কি সর্বনাশ সে করে গেল। আয়ুব খান রাজনীতি করে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তথা পাঞ্জাবিদের বাহবা কুঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু তিনিই পাকিস্তান ধ্বংস করেছেন। জিয়াও বাংলাদেশেকে বিভক্ত করে গেছে। একে জোড়া লাগান খুব কঠিন হবে। রাজনীতি আমিও করতে চাইনি, দেশের স্বার্থে বঙ্গবন্ধুর আহবানে আসতে হলো। আমার শরীরটাও ভালো ছিল না কিন্তু তার আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলাম না। একটা কর্তব্য আছে তো। চোখের সামনে অন্যায় হবে, সহ্য করতে পারি না। তাই বাধ্য হয়েই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লাম। কিন্তু আমি তো আর্মিকে এক্সপ্লয়েট করিনি। তবে কেন তোমরা আমাকে খারাপ বলবে। আমি সারা জীবন বাঙালি আর্মি গঠনের জন্য সংগ্রাম করেছি।

স্যার, সৈন্যরা আপনাকে ভালোবাসেন তাই।

এটা ভালোবাসার লক্ষণ হলো। মাত্র কজন ক্ষমতালোভী অফিসার দেশের সর্বনাশ করছে, এটা তারা বুঝতে পারে না। দেশ বড়ো না ব্যক্তিস্বার্থ বড়ো। আর এভাবে কতদিন স্বার্থ ধরে রাখতে পারবে। পাকিস্তানের মতো দেশটা ধ্বংস হয়ে যাবে। চাকমারা স্বায়ত্তশাসন চাইছে। সিলেটিরা প্রদেশ চাচ্ছে, একদিন হয়ত উত্তর বঙ্গবাসীরা তাদের বঞ্চনার দাবি তুলবে। এসব ঠেকাবে কি করে। ঢাকায় বসে শুধু গৌড়িসেন লুটপাট করলে দেশ রক্ষা করা যাবে ? ছেলেদের বুঝাতে হবে। সামরিক শাসন কোনো দেশের জন্য কখনো মঙ্গলজনক নয়। একে জংলি শাসন বলে। আয়ুব খান সামরিক শাসন দিয়ে পাকিস্তানের সর্বনাশ করেছে। একই অবস্থা এখন বাংলাদেশের। তোমাদের কাজ ছেলেদের বুঝানো।

কে কাকে বুঝাবে স্যার। অফিসারেরা সৈনিকদের এতোদিন বুঝালে হতো। উল্টা বুঝানো হলো বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা চাননি, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন। সে-জন্য পাকিস্তানিদের কাছে ধরা দিয়েছিলেন। তাদের বুঝানো হয়, বঙ্গবন্ধু ভুটান

সিকিমের মতো রাজা হতে চান। এখন বুঝানো হচ্ছে, আওয়ামীলীগ আর্মি চায় না, স্বাধীনতা চায় না- তারা ভারতের সঙ্গে মিলে যেতে চায়।

আওয়ামী লীগের অনেক দোষ-ক্রটি আছে। তাই বলে দেশকে ভারতের সঙ্গে মিলাবে কেন ? এটা তো পাকিস্তানি প্রচারণা। দেশ ত আওয়ামী লীগ স্বাধীন করেছে, ওরা করেছে নাকি? এসব জুজুবাজি ভালো না। দেশ ধ্বংস হবে।

সেই ১৯৭৫ থেকে রেডিও, টিভি, সংবাদ মাধ্যমগুলো ত সে-ভাবেই প্রচারণা চালাচ্ছে। অফিস আদালত থেকে বঙ্গবন্ধুর ছবি নামানো হলো বঙ্গবন্ধুর নাম নেওয়া হারাম করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের গান বন্ধ। কৈ আপনি ত এ-সবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াননি। বরং আপনি শয়তানের উপদেষ্টা হলেন। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করেন নি।

প্রতিবাদ করিনি। তুই এমন কথা বলতে পারলে ? তখনকার অবস্থা কি ছিল ? আমি প্রাণের মায়া ত্যাগ করে দেশের স্বার্থে সিভিল সরকার গঠনের চেষ্টা করেছি। সামরিক বাহিনীকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করেছি। আমি প্রাণ দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসতাম।

আমি জানি স্যার। আয়ুব খানের মতোই তো ডাণ্ডা মেরে এরা দেশ শাসন করছে। স্যার, এখন যাব? সোবহানবাগে আমার শ্যালকের বাসা হয়ে সন্ধ্যায় বাস ধরবো। আগামী মাসে আবার আসবো। যাবার আগে আবার অনুরোধ করবো বঙ্গবন্ধুর জন্য, স্বাধীনতা ঘোষণার ব্যাপারে কিছু একটা করুন।

(আমরা নাশতা খেলাম। স্যার আবার কিছু কাগজ দিলেন টাইপ করতে। ঘর থেকে বের হবার পূর্বে মাথায় হাত বুলালেন-আস্তে বললেন, সাবধানে থাকিস।)

সেপ্টেম্বর
১৯৮২

বঙ্গবীরের কাগজগুলি দিয়ে বললাম, স্যার আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর আপনার লেখার মধ্যে আছে।

তা-হলে এক কপি রেখে দে।

এগুলো রাখা ঠিক হবে না স্যার। আপনার বই বের হলে বই নিব। স্যার শাসক গোষ্ঠী এখন আওয়ামী লীগের চেয়ে আপনাকেই বেশি ভয় করে। সর্বত্র প্রচারণা চলছে- --(একটি কাগজ দিলাম) ঃ

ক. ওসমানী, দুর্বল চরিত্রের লোক, নেশাখোর, ভালো কমান্ডার না।

খ. তার কমান্ড-কন্ট্রোল ভালো ছিল না, সেজন্য পাকিস্তানে পদোন্নতি হয়নি।

গ. মুক্তিযুদ্ধে বসে বসে নেশা করতেন আর ভারতের সুন্দরী সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দিতেন।

ঘ. মুক্তিযুদ্ধে তিনি সশরীরে কোথাও কিছু করেন নি।

ঙ. আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ছিলেন, তাই ভারত তাকে দিয়ে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়েছে। আসলে তিনি মুক্তিযুদ্ধে তেমন কিছু অবদান রাখেন নি।

চ. তার এখন রাজনীতি করা উচিৎ নয়।

ছ. একান্তভাবে রাজনীতি করতে চাইলে, সরকারি দলে যোগদান করা উচিত। সরকার বিরোধী কোনো বক্তব্য দেওয়া উচিত নয়।

জ. তার উচিত পেনশন নিয়ে বিশ্রাম করা।

ঝ. এখন দাড়ি রেখে হজ্জ্ব করে নামাজ পড়া, রোজা রাখা।

ঞ. ইসলামিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

ঞ. ভারতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে উৎসাহিত করা ।

বাহ্। বেশতো আর কিছু করার নেই।

স্যার, সুইপার থেকে ক্যাপ্টেন, এরা সবাই এমন বলছেন। আপনার কোনো ভালো কাজের কথা কোথাও শুনছি না। ইস্ট বেঙ্গলের সৈন্যরাও না। পাকিস্তান আমলে যেমন অফিসারেরা সোহরাওয়ার্দী-মুজিব-ভাসানীর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাত, তেমনই এখন হচ্ছে।

হ্যাঁ আমারও মনে হচ্ছে। বেশ কিছু লোক আমাকে বিশ্রাম নিতে পরামর্শ দিচ্ছেন। তোমার কি মনে হয় সেবার নির্বাচনে জিতেছিলাম।

ঠিক বলতে পারবো না। তবে অনেক অফিসারের মুখে শুনেছি। নির্বাচনের ফলাফল জেলা কেন্দ্র থেকে যাওয়ার পূর্বে তারা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে তাদের তৈরি ফলাফল পাঠিয়েছেন। আবার কেউ কেউ বলেন যে ঢাকাতেই একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে নির্বাচন কক্ষে ফলাফল সরবরাহ করা হয়েছে। তাই মনে হয় আয়ুব খানের ফাতেমা জিন্নাহকে পরাজিত করার মতো একটা সূক্ষ্ম প্লান কাজ করেছে।

কিন্তু দেশের মানুষ কিছুই বুঝতে পারল না।

স্যার, সেটাও আপনাদের কোন্দল আর দুর্বল নেতৃত্বের জন্যে। ডালিম-মোশতাককে বয়কট করতে হতো।

নেতারা আমার কথা শুনলো কৈ? ওরা তো গিয়ে মোতশাক-জিয়ার পিছনে দাঁড়াল। আমাকে ওরা বাঁচিয়ে রেখেছে এটাই তো বিস্ময়। পাকিস্তানসহ বিদেশিরা সভ্যতার নামে এ দেশবাসীকে শোষণ করেছে, জিয়া কর্তৃক সৃষ্ট গোষ্ঠীও তেমনি এ-দেশবাসীকে শোষণ করবে, শাসন করবে, জনকল্যাণ কিছু হবে না। হয়ত ক্ষমতা বদল হবে মাত্র। দেশের গুটিকয়েক প্রাসাদ আর রাজপথ ঝকঝক করলেই দেশের মঙ্গল হয় না। এই মুহূর্তে যারা দেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদের কারো দেশবাসীর প্রতি তেমন ভালোবাসা নেই। একটা কথা মনে রেখো, দেশের সবাই যেমন দেশপ্রেমিক নয়, তেমনি সব নেতারা দেশবাসীর মঙ্গল চায় না। দেশবাসীর নামে নিজের মঙ্গল চায়। এরা নির্বাচনে জিতে নির্বাচক মণ্ডলির মঙ্গলের জন্য নয়– নিজেদের লাইসেন্স-পারমিট, টাকা রোজগারের জন্য। সত্যিকারের দেশপ্রেমিক নিজের জন্য ভাবে না, ভাবেন

দেশের জন্য। যারা এখন নেতা তাদের সবারই ঢাকায় বাড়ি-গাড়ি আছে। ব্যবসা-বাণিজ্য আছে, যাদের নেই তারা চেষ্টা করছেন। তিনি যে অঞ্চল থেকে নির্বাচিত হলেন, সেখানের জন্য তার ভাগ্য গড়ার কাজে লেগে যেতেন না।

নির্বাচিত হয়েই তারা যদি তার অঞ্চলের উন্নয়নমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতেন। তখন আমলারা উন্নয়ন বরাদ্দের অর্থ ভাগ-বাটোয়ারা করবার সুযোগ পেতেন না। এসব দেখেশুনেই বঙ্গবন্ধু ক্ষ্যাপে গিয়েছিলেন। কারণ তার মন থাকত দেশবাসীর নিকট। তাঁকে আমরা ভুল বুঝলেও তিনি নিজে কোনো ভুল করেননি। অনেকে অন্যায় করে সে অন্যায়কে ঢাকবার জন্য তাকে দোষারোপ করেছে। তাকে যারা দোষারোপ করেন, সে যে কেউই হোন না। সাংবাদিক, শিল্পী, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, যা হোন না কেন--- খুঁজে দেখ, তিনি ভীষণ অসৎ, লোভী, মিথ্যাবাদী। তাই এরা বঙ্গভবনে যায় রাতের আঁধারে জিয়া-এরশাদকে খুশি করতে। ফায়দা আদায় করতে। এরা ক্লাইভ, জিয়া-এরশাদের মতো লোকই চায়-- দেশ দরদিকে নয়। সিরাজ-বঙ্গবন্ধু এদের শত্রু। আগস্ট পঁচাত্তরের ফল ভোগ করতে হবে। এতো সহজে তোমাদের পাপ খণ্ডন হবে না। তোমাদের ভাগ্যে অনেক কষ্ট আছে। যে মুক্তিযোদ্ধা একদিন রাজাকার আলবদর শান্তিকমিটির বিরুদ্ধে লড়েছে, সেই এখন ওদের সালাম দিবে। জিয়ার সবচেয়ে বড়ো অপকর্মই সেটা।

স্যার, পঁচাত্তরের আগস্টের ঘটনা আমাকে ১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধের কথা মনে করিয়ে দেয়। ক্ষমতা লোভী মিরজাফর ইংরেজ বেনিয়াদের পা চেটেছিলেন। হিন্দু বেনিয়ারা ক্লাইভকে সাহায্য করেছিলেন।

ঠিক বলেছ। ১৭৫৭ সালে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন ইংরেজ বেনিয়া লর্ড ক্লাইভ আর মিরজাফর। স্বাধীনতা উত্তর ১৯৭৫ এর ঘটনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে সিআইএ, সহযোগিতা করেছে মোশতাক এবং ষড়যন্ত্র করেছে মাস্টার জিয়া। বাংলার ইতিহাসে মিরজাফর যেমন ঘৃণিত, কলঙ্কিত, মিরজাফর নামে যেমন আজকাল কোনো ছেলের নাম রাখে না, ঠিক তেমনি একদিন জিয়াকেও বাঙালিরা ঘৃণা করবে, জিয়া নামে কোনো সন্তানের নাম কেউ রাখবে না। ১৭৫৭ এর সঙ্গে ১৯৭৫ এর আগস্ট ঘটনার একটি বিশেষ মিলও সেখানে। মিরজাফরের পরে জিয়াই হচ্ছে বাঙালির সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তিত্ব।

মিরজাফর যেমন বিশ্বাসঘাতক, বেঈমান নামে সুপরিচিত, তেমনি জিয়াও মোনাফেক-বেইমান। ক্লাইভ যেমন মিরজাফরকে ও তার সহযোগীদের ক্ষমতার শেয়ার দিয়েছিল, জিয়াও তেমনি মশিউর, শাহ আজিজ, আলিম, মান্নানদের মতো নরপশুদের ক্ষমতার অংশ দিয়েছিলেন। পলাশির পরে যেমন শাসনক্ষমতা এ দেশবাসীর নিকট থেকে ইংরেজদের নিকট চলে যায়, পঁচাত্তরের পরেও তেমনি শাসনক্ষমতা একটি বিশেষ গোষ্ঠীর নিকট চলে যায়। জনগণের এতে কোনো ভূমিকা ছিল না। ইংরেজরা যেমন শিক্ষার নামে, সভ্যতার নামে বাঙালিকে গোলাম করেছিল। জিয়ার অনুসারীরাও তাই করবে। আমার কথা তোমাদের ভালো লাগবে না কিন্তু এটাই বাস্তবতা। পরে দেশবাসী টের পাবে।

স্যার, ২৫ শে মার্চ বঙ্গবন্ধু আপনাদের চলে যেতে বলেছিলেন কিন্তু আপনি ঢাকার নিউ ইস্কাটনের বাড়িতে আত্মগোপন করেছিলেন কেন ?

পাকিস্তানের যে কোনো সম্ভাব্য অভিযানের মুখে ভারত আমাদের সাহায্য করার কথা ছিল। আমি বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলাম, ভারত যদি প্রথম আঘাতে ঢাকা বিমান বন্দর ধ্বংস করে দেয় তো আমরা নিজস্ব শক্তিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করতে পারব। কারণ বিমানবন্দর ধ্বংস হলে পাকবাহিনী অচল হয়ে যেত। সে-জন্যই কয়েকদিন অপেক্ষা করেছি। (অসমাপ্ত)

ভারত কি এমন আক্রমণ করতে পারত ?

সেভাবেই তো আমরা চেয়েছিলাম। ওরা না পারলে জানিয়ে দিত। সে সময়ে তো পাকিস্তান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। বিমান ঘাঁটি আর বিমান কটি ধ্বংস হলে ওরা আত্মসমর্পণ করতো। সে-সময় ওদের তেমন অস্ত্রশস্ত্রও ছিল না।

ভারত কি তবে তার ওয়াদা থেকে সরে গিয়েছিল।

অবশ্যই। তারা চেয়েছিল প্রথমে বাংলাদেশের বিপর্যয়। দ্বিতীয়ত সামরিক ও অর্থনৈতিক ধ্বংস। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তাজের দূরদর্শিতা, অসীম সাহসিকতা, কুশলী ভূমিকার কারণে ভারত তা করতে পারেনি। তাজের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা জাতিকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছিল।

স্যার, শুনেছি তার সঙ্গে আপনার মতবিরোধ ছিল ?

ন্য। তাজ বিরোধীরা সুকৌশলে এসব প্রচার করতো।

স্যার, স্বাধীন দেশে পদাতিক একটি মাত্র রেজিমেন্ট, রাষ্টপতিকে আর একটি রেজিমেন্টের কথা বলুন না।

ওরা কি আমার কথা শুনবে? ওরা এ-সবের গুরুত্ব দেয় না। দেশ থাকলে পদাতিক রেজিমেন্ট আরো হবে। চিন্তার কিছু নেই।

আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের দাবি কি এখন করা উচিৎ নয়।

না। ওটা ভারত সহজে ছাড়বে না। তিন বাংলা এক না হলে আন্দামান-নিকোবর পাব কি করে ?

মহাবঙ্গের জন্যে আমাদের চেষ্টা করা উচিৎ নয় কি ?

শতকরা দশ ভাগ বাঙালিও তা এখন চায় না। যখন চল্লিশ শতাংশ বাঙালি এক বাংলা চাইবে তখনই বাংলা এক হবে। তখন কেউ ঠেকাতে পারবে না।

স্যার, আপনাকে অনেকবার বলতে শুনেছি, ১৯৪৭ এ ২% লোকও স্বাধীন বাংলার পক্ষে ছিল না-সেই পূর্ব বাংলা এখন স্বাধীন।

সেটা বঙ্গবন্ধু-তাজ-ভাসানীর আজীবন সংগ্রামের জন্য হয়েছে। অমন নেতা আবার কবে জন্মাবে কে জানে ?

স্যার, পাকিস্তান থেকে ফিরে শুনছি, বঙ্গবন্ধু শক্তিশালী সেনাবাহিনী চান না ?

(অসহিষ্ণুভাবে) মিথ্যে কথা। ধীরে ধীরে একটি বিশাল বাহিনী গড়ে তোলার জন্য তারই সবচেয়ে বেশি ইচ্ছা ছিল। বিএমএ (বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি) প্রতিষ্ঠা এবং পাকিস্তান থেকে বাঙালি সৈন্যদের ফেরত আনা তারই প্রমাণ। জিয়ারা তোমাদের ফেরত আনারই বিরুদ্ধে ছিল।

ওরা কারা স্যার ?

জিয়া-শওকত-শিশু-আকবর-

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মতবিরোধের পর তার সঙ্গে আপনার আলাপ হয়।

হাঁ, গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ে তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করতেন।

ব্যক্তি সম্পর্কেও আমাদের কোনো বিরোধ ছিল না।

স্যার, মেজর রফিক লিখেছেন ২৫ মার্চ রাতে পরিকল্পনা মোতাবেক জিয়া ইবিআরসি আক্রমণ প্রতিহত করলে শত শত বাঙালি সৈন্য মরতো না।

ঠিক বলেছে। প্রত্যক্ষ আক্রমণ করতে হলে খুব সাহসী হতে হয়। জিয়ার তা ছিল না। তবে সে ট্যাক্টফুল ছিল। ধীর স্থির ছিল। সে ছিল ক্ষমতালোভী, সুযোগ সন্ধানী। নয় মাস মুক্তিযুদ্ধে তেমন কোনো প্রত্যক্ষ আক্রমণ সে চালায়নি। ফ্রন্ট লাইন যাকে বলে, সেখানে তার অবস্থান খুব একটা ছিল না। ৪/৫টির বেশি হবে না। অবশ্যই সে বীর ছিল। খুব সাহসী না হলেও ট্যাক্টফুল ছিল। গুড কমান্ডার ছিল।

সে-জন্যই তাকে প্রথম ব্রিগেড কমান্ডার নিয়োগ করি। তোমাকে একটা কথা বলি বঙ্গবন্ধুর মতো জিয়াও দেশটাকে ভালোবাসত।

তাকে আপনি চাকরি থেকে সরাবার চেষ্টা করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

তার ক্ষমতালোভ, উচ্চাভিলাস এবং আপসকামিতার জন্য। শেষে তাই তো হলো। ক্ষমতালোভ মানুষকে অন্ধ করে, আপস করতে বাধ্য হয়।

স্যার, পাকিস্তান প্রত্যাবর্তন ক্যাম্পে প্রতিমাসে সিও দরবার নিত। প্রতি দরবারে ক্যাম্প কমান্ডার এক পর্যায়ে বলতেন, তোমরা ইস্ট পাকিস্তানে যাচ্ছ যাও, কিন্তু বেশিদিন থাকবে না। বড়ো জোড় দু-বছর, তোমরা আবার ফিরে আসবে। আমরা আবার এক হবো। সে প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। প্রতিমাসে এই একই কথা শুনতে শুনতে আমরা ত্যক্ত-বিরক্ত হতাম। কর্নেল ইয়াসিনকে ত চিনেন, তিনি খুব আশংকা করে বলতেন, এর কথার কোনো রহস্য আছে। বাংলাদেশে জেএসডি'র কার্যকলাপ ভালো লাগছে না। গোলাম আজম, মাহমুদ (সিলেট), হামিদুল হক চৌধুরী-এরা তো বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রোপাগ্যান্ডা করে বেড়াচ্ছে। আমাদের খুব সাবধান হতে হবে। তারপর দেখুন আমরা ফিরার ঠিক দু-বছরের মাথায় বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার হত্যাকাণ্ড ঘটলো।

তবে তার আশঙ্কা তো ঠিক হলো। খুনিরা পাকিস্তানের পরিকল্পনাই বাস্তবায়ন করেছে।

স্যার, জিয়ার কার্যকলাপ পর্যালোচনা করে আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছি যে, মুক্তিযুদ্ধে তিনি পাকিস্তানি অ্যাজেন্ট ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের মূল নায়ক তিনি। রিসালদার সরোয়ার মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা আগে আমার বাসায় এসেছিল তাকে পেনশনের ব্যবস্হা করে দিতে। তার কাছে জানতে পারি যে, দেশত্যাগের আগে চার জাতীয় নেতাকে হত্যার শর্ত জিয়া দিয়েছিলেন, তাই তারা জেলে তাদের হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সারোয়ার আরো বলেছিলেন, মোশতাক জিয়ার হাতের পুতুল ছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হবে একথা তাদের বলা হয়নি। পরে তারা বুঝতে পারে ফারুকদের পরিকল্পনা ছিল পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যা আমরা ক্যাম্পে শুনতাম। সিজিএস খালেদ স্যারের বিদ্রোহে জিয়া ফারুকের প্লান ভেস্তে যায়। স্যার, রিসালদার সুরুজ মিয়া-আমরা লায়ালপুর সেন্ট্রাল জেলে এক সঙ্গে ছিলাম-আমার বাসায় কয়েকবার এসে ছিল কর্নেল ফারুকের বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য। সুরুজ মিয়ার নিকট জানতে পারি যে, ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ পাকিস্তানের সঙ্গে মিলে যাবার ঘোষণা দেবার কথা ছিল। কিন্তু মেজর ডালিম তা শোনেনি। তার কথা ছিল আমরা যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছি। এখন স্বাধীনই থাকবো। তবে দেশ ইসলামিক রাষ্ট হবে পাকিস্তানের সঙ্গে সুসম্পর্ক হবে। এ জন্য বেতার ভবনে জিয়া এবং ফারুক ডালিমকে খুব বকাবকি করেছিলেন। খন্দকার মোশতাকও ডালিমের পক্ষে ছিলেন। জিয়ার সঙ্গে ছিলেন আমেরিকা-সৌদি আরব আর পাকিস্তান। ১৫ আগস্ট সকালে ডালিমের বেতার ঘোষণার আগে বেতার ভবন থেকে জিয়া পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছিলেন, তার পাশে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ছিল। ১৯৭৭-৭৯ কর্নেল মহিউদ্দিনের সঙ্গে বদিউজ্জামান রোডে পাশাপাশি ছিলাম। ১৯৭১ হতে পঁচাত্তর পর্যন্ত জিয়ার সঙ্গে যত কথাবার্তা হয়েছে তার একটা টেপ রেকর্ড ওনাদের কাছে ছিল। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন, জিয়ার নেতৃত্বেই তারা ঐ অপারেশন কার্যকর করেন। নইলে সম্ভব হতো না। টেপটা শোনাতে চেয়েছিলেন কিন্তু শুনতে পারিনি।

এখন আর তোর কথা অস্বীকার করছি না। শুরু থেকে আমরা জিয়াকে ঠেকাতে চেষ্টা করেছি কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতারা জিয়া গোলক ধাঁধাঁয় আমাদের বিশ্বাস করেনি। আমরা ব্যর্থ হয়েছি।

কিন্তু দুঃখ হয় স্যার, আওয়ামীরা আপনাকে মোশতাক-জিয়ার লোক ভাবে। আপনিও একাত্তরের শ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা খালেদ মোশাররফের জন্য কিছু করলেন না।

চিন্তা করিস না- একদিন সকালে উঠে দেখবে সারা দেশে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বলে জয়ধ্বনি করছে। আইয়ুব-ইয়াহিয়ার মতো জিয়া-মোশতাককে দেশবাসী ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করেছে। জিয়ার নামে কেউ সন্তানের নামও রাখছে না। আমাকেও সেদিন লোকজন ঠিকই বুঝে উঠবে। সত্য কোনোদিন ধামা-চাপা থাকে না।

বঙ্গবন্ধু কি কখনো আপস করেছেন।

আমার জানামতে একবার-পাকিস্তান থেকে বাঙালি কর্মচারীদের ফিরিয়ে আনার জন্য পাকিস্তান যুদ্ধবন্দিদের বিচার না করা। তিনি কখনো নীতির সঙ্গে আপস

করেন নি। দেশবাসীর বিরুদ্ধে মৌলবাদীদের সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের কাছে, পাশ্চাত্যের কাছে কখনো না।

স্যার, মুজিববাহিনী কি মুক্তিযোদ্ধা নয় ?

ও ইয়েস। ওদের আমরা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিলাম। ওদের সংখ্যা বেশি নয়, হাজার দশেক থেকে চৌদ্দ হাজার মাত্র ।

কাদেরিয়া বাহিনীকে মুক্তিযোদ্ধা বলা যাবে ?

হাঁ। তারা মুক্তিবাহিনীর তালিকাভুক্ত। ওরা টাঙ্গাইল সাব-সেক্টরের নিয়ন্ত্রণাধীন। কাদের সিদ্দিকী টাঙ্গাইল সাব-সেক্টর কমান্ডার ছিলেন।

স্যার, শুনি মুক্তিযোদ্ধাদের একটি তালিকা ভারত সরকার দিয়েছিলেন। আমার ছোটো ভাই, দুই ভাতিজা, দুই মামাত ভাই, গ্রামের কয়েকজন ভারতের দেরাদুনে প্রশিক্ষণ নিয়েছে, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল থেকে বলেছে তারা মুক্তিযোদ্ধা নয় তারা বীরযোদ্ধা।

এটা ঠিক নয়, ওরাও মুক্তিযোদ্ধা। ওদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ভারত সরকার থেকে পাওয়া গিয়েছিল। তাজউদ্দিন উহা জেনারেল জিয়াকে দিয়েছিলেন। ওটা সম্ভবত সেনাসদর রয়েছে।

স্যার, দেশে ফিরে দেখলাম, অনেক পরিচিত ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধে যোগদান না করেও মুক্তিযোদ্ধা সনদ সংগ্রহ করেছে।

করতে পারে। কিন্তু তারা মুক্তিযোদ্ধা নয়। সকল মুক্তিযোদ্ধার নাম তালিকাভুক্ত রয়েছে। তালিকায় যাদের নাম নেই তারা মুক্তিযোদ্ধা নয়। দেখো সৈন্যদের মতো অনেক পুলিশ, ইপিআর, আনসার মুজাহিদ মুক্তিযুদ্ধে যোগদান না করলেও দেশের মধ্যে সক্রিয় ছিল। স্বাধীনতার পর এদের অধিকাংশই অনেক মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধের সনদপত্র যোগাড় করেছে। এরা মুক্তিযোদ্ধা নয়। আবার ওদের মতো অনেক চাকরিজীবীও ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা হয়েছে। আমার দেশের মধ্যে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণকারীকেও অনেকে শহীদ বলে দাবি করেছে।

স্যার, ২৫ শে মার্চ রাতে কিংবা পরে পাকবাহিনী যাদের হত্যা করেছে তারা কি সবাই শহীদ ?

ইয়েস, অবশ্যই ।

স্যার, ১৯৭৩ সনে যখন ফিরলাম, তখন ঢাকা বিমানবন্দরে দেখলাম একদল লোক উত্তরবঙ্গ বলতে আঁতকে উঠেছিলেন ?

ওরা না বুঝেই ও-রকম ভয় করে– না বুঝে যেমন লোক ভণ্ডপিরকে ভক্তি করে। উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ–ওগুলি আমার জন্মসূত্রে পরিচয়, ভয়ের কি আছে ?

তবে কি বঙ্গবন্ধু দেয়া দেশের নাম বাংলাদেশ ঠিক হয়নি?

এর মূল্যায়নের সময় এখনো আসেনি।

স্যার, শুনেছি মুজিবনগর সরকার গঠনে জটিলতার কারণেই পরবর্তীতে ১৫ আগস্টের ঘটনা ঘটে।

মুজিবনগর সরকার গঠনে এবং সে সময়ের অনেক অসুবিধা ছিল।

তাই বলে তাই পঁচাত্তরের ঘটনার কারণ নয়। সবার মনে রাখা দরকার যে ১৫ আগস্টের ঘটনার প্রধান কারণ একাত্তরে আমেরিকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঠেকানোর ব্যর্থতা। তারা একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ হিসাবে এদেশের একদল ক্ষমতালোভী গণশত্রুর সহযোগিতায় তাদের অভিষ্ট লক্ষ্য চরিতার্থ করতে সক্ষম হয়।

স্যার, মুক্তিযুদ্ধের সময়ে, বিজয়-উত্তর এমন কি এখনো অনেকে বাংলাদেশে জাতীয় সরকার গঠনের দাবি করেন। এর যুক্তি কি ?

স্বাধীনতার পক্ষের দলগুলি যেমন, ন্যাপ, কম্যুনিস্ট পার্টি, প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু থেকে 'জাতীয় সরকার গঠনের' দাবি করে, বিজয় উত্তরও করে এবং এখনো অনেক লোক মনে করে এদেশে জাতীয় সরকারের বিকল্প নেই। অন্তত দশ-পনেরো বছর এমন ব্যবস্থা দরকার। জানি না এটা তারা সজ্ঞানে করেছেন কিংবা অন্যের প্ররোচণায় করেছেন। এ দাবির কোনো নৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল না। বরং এটা করা হলে মুক্তি সংগ্রাম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতো। প্রবাসী সরকারে দৃঢ়তার জন্য এমএনএ ও এমপিএ সকলেই সরকারকে সমর্থন করায় এবং মাওলানা ভাসানী ও আবদুস সামাদ আজাদের প্রচেষ্টায় জাতীয় সরকার গঠনের দাবি প্রত্যাহার করা হয়। তবে স্বাধীনতার পরে এরাই আবার সর্বদলীয় সরকার গঠনের দাবিতে দেশবাসীকে বিব্রত করে। জাতীয় সরকার গঠনে আমাদের মতো দেশে ফল ভালো হবে না। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের বিজয় এবং হক মন্ত্রিসভা এর জাজ্জল্য প্রমাণ। যারা জাতীয় সরকারের দাবি করছিলেন তারা আসলে জন সমর্থনহীন ছিল। এদের দ্বারা সরকার গঠন করা হলেও এরা কোনো ভালো কাজ করতে পারত না।

মাস্টার জিয়ার প্রথম সরকারও কতকটা জাতীয় সরকার ছিল। কিন্তু তারা কাজের চেয়ে অকাজই বেশি করেছিল। সৎ উদ্দেশ্য, ভালো নেতৃত্ব এবং জন সমর্থন না হলে ভালো সরকার গঠন করা যায় না এবং সে সরকার দ্বারা জনকল্যাণ হয় না। যারা জাতীয় সরকার গঠনের দাবি করেছিলেন তারা সত্তরের নির্বাচনের পরাজিত পক্ষ, নেতৃত্ব এবং একাত্তরের স্বাধীনতা বিরোধী পরাজিত দল। কাজেই ও পক্ষের দাবির মধ্যে অনেক খারাপ নিয়ত ছিল। জিয়ার দলে মিলে তারা পরবর্তীতে সেই নিয়ত পুরা করেছে। সালাহউদ্দিন কাদের, আনোয়ার জাহিদ, মশিউর রহমান, শাহ আজিজ প্রমুখ নেতা। দেশের মধ্যে কোনো না কোনো একটা বড়ো সমস্যা থাকবেই তাই বলে তখন জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে এমন ব্যবস্থা হতে পারে না। তাহলে তো গণতান্ত্রিক সরকার চলতেই পারবে না।

ডিসেম্বর

১৯৮২

স্যার, আজকাল সংবাদপত্রে প্রায়ই মুক্তিযোদ্ধাদের অবর্ণনীয় দুরাবস্থার চিত্র প্রকাশ পায়। কেউ রিক্শা চালায়, কেউবা ভ্যান চালায়। সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন করতে ব্যর্থ হলো কেন ?

সরকার ব্যর্থ হয়েছে বলা ঠিক হবে না। ৮০-হাজার মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন করার জন্য বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ছিল। তারা এসেছিলেন সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে। তাদের মধ্যে একটা বড়ো অংশ ছিল ছাত্রসমাজ। অস্ত্র জমা দিবার সময় আমরা তাদের বলেছিলাম, যারা চাকরি করবে তারা যেন নাম লিখায়। যারা নাম লিখেছিলেন, তাদের সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, পুলিশ, বিডিআর এবং রক্ষীবাহিনীতে ভর্তি করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্ররাই চাকরি করতে চায়নি, পড়াশুনা করতে চেয়েছিল। এরা ৭২, ৭৩ সালে পরীক্ষা দিয়ে পাশও করেছে। ইতোমধ্যে ভূয়া মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং সরকারের পক্ষে তখন সত্যতা যাচাই করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। তবুও নানাভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের চেষ্টা চলছিল। একটা কথা মনে রাখবে, মুক্তিযোদ্ধা বলেই তো সবাই অফিসার হতে পারে না। অনেকেই তাই চাচ্ছিল। ছোটো খাটো চাকরি তাদের পছন্দ হতো না, ফলে তারা বেকার থেকে যায় এবং এরাই পরবর্তীতে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। বিশেষ করে পঁচাত্তরের পট পরিবর্তনে সবকিছু ওলট পালট হয়ে যায়। নইলে ৭৭/৭৮ সনের মধ্যে ৮০ হাজার মুক্তিযোদ্ধার পুনর্বাসন হয়ে যেত।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মোতাবেক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছিল।

<u>বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে কোনো মুক্তিযোদ্ধাকে রিকশা চালাতে হতো না।</u> বিজয়োত্তর হাজার হাজার লোকের চাকুরি হয়, আর মাত্র কয়েক হাজার মুক্তিযোদ্ধার পুনর্বাসন হতো না? তাছাড়া দেশবাসীও মুক্তিযোদ্ধাদের মর্যাদাপূর্ণ পুনর্বাসনের পক্ষে ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের জন্য তাদের বয়স রিলাক্স করা হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন কঠিন সমস্যা ছিল না। সমস্যার সৃষ্টি করা হয়েছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি: সেনাবাহিনীতে ভর্তির বয়স ১৭-২৭ বছর ছিল। জিয়া ভর্তির বয়স ১৯ বছর করলো। সেনাবাহিনীতে বিবাহিতরা ভর্তি হতে পারত। জিয়া বিবাহিতদের ভর্তি বন্ধ করলো। এ-দুটি কারণেই হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা ভর্তি হতে পারলো না। পঁচাত্তরে এসে রক্ষীবাহিনীও বন্ধ হয়ে গেল। পুনর্বাসনের নামে সামরিক সরকার ওদের নিজ স্বার্থে ব্যবহার করতে লাগলো। প্রত্যাবর্তনকারী অনেক অফিসার মুক্তিযোদ্ধাদের সহ্য করতে পারতো না। অনেক মুক্তিযোদ্ধা ব্যবসা করতে শুরু করে। বেশির ভাগই ব্যবসায় ব্যর্থ হয়। পরে এরাই আবার চাকরি করার জন্য এসেছে। তখন বয়স অনেক হয়েছে। এমতাবস্থায় ওদের কিভাবে সাহায্য করবে। কে করবে? তাদের জন্য যে-সব সুযোগ-সুবিধা ছিল তা তারা পেয়েও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। তবে আমার বহু ছেলে কোনো প্রকার সাহায্য পায়নি। তারা বেশির ভাগ গ্রামের ছেলে। তারা সময়মতো জায়গামতো যেতে পারেনি, সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি। বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে শত শত মুক্তিযোদ্ধা ছিল। স্বাধীনতার পরে তারা রেজিমেন্টের সঙ্গেই ছিল। আমি তাদের আর্মিতে অ্যাবজরব করতে নির্দেশ দিয়েছিলাম। সে-ভাবেই তারা ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ছিল। বলা যায় স্বাস্থ্যগত কারণে তাদের অনেককে বাদ দেওয়া হয়। তারা চাকরি হারায়,

পেনশনও পায়নি। এদের একটা ব্যবস্থা দরকার ছিল। এদের বেসরকারি প্রশাসনে/মন্ত্রণালয়ে যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগব্যবস্থা অতি সহজে হতে পারতো। জিয়ারা হতে দেয়নি। এখন কে কার কথা শোনে। জিয়া ছলে বলে, নিজ স্বার্থে, রাজাকারদের সর্বত্র নিয়োগ করেছে। এরশাদও করছে। স্বাভাবিক কারণেই অসহায় মুক্তিযোদ্ধাদের দেখবার কেউ নেই। অথচ এদের সংখ্যা বেশি একটা নয়।

দেশের শ্রেষ্ঠতম দেশপ্রেমিক সন্তানরা রিকশা চালাবে কেন? দেশের প্রশাসন জিয়া তথা স্বাধীনতাবিরোধী পক্ষ দখল করায় দেশের সবরকম অমঙ্গল ঘটেছে। স্বাধীনতাবিরোধীদের অতি সূক্ষ্মভাবে পুনর্বাসিত করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

স্যার, জামাত নেতা মওদুদি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করলেও পরে তা মেনে নেয় কিন্তু বাঙালি জামাতিরা স্বাধীন বাংলাদেশকে মেনে নিতে পারছে না। গ্রামাঞ্চলে মওলানা, মৌলবি, মসজিদের ইমাম, মাদ্রাসার শিক্ষক- এরা ভিতরে ভিতরে জামাতি কিন্তু মুখে স্বীকার করে না। এই ১৯৮২ সালেও তারা খুব চালাকি করে গ্রামের মানুষকে বিভ্রান্ত করে এই বলে যে পাকিস্তানই ভালো ছিল। ভারত তাদের স্বার্থে পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ করেছে। এতে বাঙালির কোনো হাত নেই।

মওদুদির মতো এরাও স্বাধীন বাংলাদেশ মেনে নিত। নিজেদের ভুল স্বীকার করতো কিন্তু সিআইএ, আইএসআই এবং জিয়া তা হতে দেয়নি। জিয়া জামাতিদের পুনর্বাসন করেছে, সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে। ফলে এরা ভুল পথে রয়েছে। যদি না শোধরায় ওরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

মার্চ
১৯৮৩

সিরাজুল ইসলাম ভূঁইয়ার নিকট জানতে পারলাম বঙ্গবীর খুব অসুস্থ। ঠিক দু-টায় সিএমএইচ গেলাম। তখন ভিআইপি ওয়ার্ড অরক্ষিত অবস্থায়। তার কাছে যেতেই হাত ধরে বললেন, আমি বোধ হয় আর বেশিদিন বাঁচবো নারে। তোর মা-দাদার সঙ্গে আর দেখা হলো না।

স্যার, কাউকেও তো দেখছি না। অ্যাটেনডেন্ট, আপনার ব্যাটম্যান ওরা কৈ?

ক্যান্টিনে গেছে বোধ হয়। তুই ভালো আছিস-উকালতি করবি না?

আমি ছাড়তে পারছি না- কিভাবে ছাড়বো তাও বুঝতেছি না। শত শত অনিয়ম। একটা ঠিক করি তো আর একটা এসে হাজির।

এরশাদ যেভাবে লেগেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের রাখবে না।

স্যার, আমি একবার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলে গিয়েছিলাম। ওরা তো এরশাদ বলতে পাগল।

ওরা বোঝে না, দ্বিতীয়তঃ টাকা খায়, এরশাদ টাকা দিয়ে ওদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে? তোর কি মনে হয় এরশাদ ক্ষমতায় টিকতে পারবে?

পারবে মানে ! দশ-বিশ বছর অথবা না-মরা পর্যন্ত সিংহাসন ত্যাগ করবে না। আরব রাষ্ট্রগুলির মতো রাজা বাদশাহর হালে থাকবেন। আমি এখন নিশ্চিত স্যার, জিয়া-মঞ্জুরকে হত্যার মূল নায়ক তিনি। জিয়া যখন তার ভুল বুঝতে পেরে জামাতিদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন শুরু করেছেন তখনই ওরা এরশাদকে দিয়ে, জিয়া-মঞ্জুরকে বিদায় করেছে। শওকতকে বিদেশে পাঠিয়েছে। জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী, ব্রিগেডিয়ার খালেকুজ্জামান, ব্রিগেডিয়ার গিয়াসসহ উর্ধ্বতন মুক্তিযোদ্ধাদের নিষ্ক্রীয় করেছে। বলতে গেলে তার পথ নিষ্কন্টক। তার গায়ে কেউ আঁচড় দিতে পারবে না।

স্যার, মেজর জামাল বলেছে, ২৯ শে মে জেনারেল এরশাদ গোপনে হেলিকপ্টারে ইবিআরসি গিয়েছিলেন। মেজর জামাল, সেন্টার কমান্ড্যান্ট ব্রিগেডিয়ার আজিজ, জিওসি জেনারেল মঞ্জুর ও জি-ওয়ান শুধু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জেনারেল এরশাদের সঙ্গে জিওসিও সেন্টার কমান্ডার কথা বলেন। হেলিপ্যাড থেকেই এরশাদ চলে আসেন। রাতে ঘটে অঘটন। মেজর (পরে কর্নেল) জ্যাগ বিভাগের প্রতিনিধি লতিফ, আমার কোর্সমেট, বলেছেন, জেনারেল মঞ্জুরকে কারের মধ্যে হত্যা করেছে ক্যাপ্টেন এমদাদ। মঞ্জুর হত্যার কাহিনী যে-সব প্রচারিত হচ্ছে, সে-সব বানোয়াট, কল্প কাহিনী ।

বঙ্গবীর উঠলেন, বললেন, ধর। মাঠের মধ্যে একটু হাঁটি, শুয়ে শুয়ে আর ভালো লাগে না। আমি তাঁর হাত ধরে, ভিআইপির পিছনে সৈনিকদের খেলার মাঠে নিলাম। বললেন, তুই এসব নিয়ে কারো সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিস না। জানতে পারলে ওরা তোরে মেরে ফেলবে।

স্যার, মৃত্যুভয় আমার নেই। মৃত্যু তো আল্লাহর হাতে। নইলে বঙ্গবন্ধু, জিয়া-মঞ্জু ওভাবে প্রাণ হারাতেন না। মনে হচ্ছে আপনাকে মারার জন্য এখানে অরক্ষিত রেখেছে। আপনি বরং পিজিতে যান।

ওখানে গেলে আজরাইল যেতে পারবে না ?

পারবে, আমি থামলাম। বললাম, স্যার, দেশ তো নেতৃত্বহীন হচ্ছে। আগে ড. কামালকে ভালো মনে করতাম, এখন কেমন যেন গোলমেলে লাগছে। মিজানুর রহমান চৌধুরী, ফরিদ গাজী, রাজ্জাক- সবাই কেমন যেন হয়ে গেলেন।

শুধু ওরা কেন, প্রফেসর ইউসুফ আলী, ভাবতে পারা যায়, তার মতো লোক জিয়ার সঙ্গে মিলে ?

সবই কপাল স্যার। নইলে বঙ্গবন্ধু হত্যা হলো। একটি লোক পথে নামলো না। মনে হলে বুক ফেটে যায়।

আমরা সবাই ভুল করেছি বুঝলে।

স্যার, আপনি বলেছেন ১৯৭৫ সালের নভেম্বরের মধ্যে নির্বাচন হতো-- তেমন কোনো দলিল তো এখন পর্যন্ত দেখলাম না।

আমরা তিনজন নির্বাচন দিতে চেয়েছিলাম। ডালিমরাও তাই চেয়েছিল। কিন্তু ডার্ক হর্স হতে দেয়নি। তার সঙ্গে আমেরিকা ছিল।

নির্বাচন হলে তো ওরা ক্ষমতায় থাকতে পারতো না। নির্বাচনের জন্য আমরা চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু সে চেষ্টাকে বাঞ্চাল করার জন্য ওরা আর্মির মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি লাগিয়ে রেখেছিল। পাতানো খেলা আর কি।

১৮ আগস্ট ১৯৭৫ - এ নিয়ে আমাদের বিস্তর আলোচনা হয়েছিল। সব পক্ষই তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য রাজি ছিল। তিনটি বিষয়ে সব সিদ্ধান্ত ছিল:

(এক) তিন মাস সামরিক শাসন বলবৎ থাকবে। জরুরি আইন নির্বাচন পর্যন্ত থাকবে;

(দুই) সংসদ ভেঙে দেওয়া হবে না, স্থগিত রাখা হবে;

(তিন) তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

কিন্তু সে আলোচনা কিংবা সিদ্ধান্ত না হতেই আপনি মোস্তাকের উপদেষ্টা পদে যোগ দিলেন কেন?

ওরা সবাই আমাকে সেজন্য অনুরোধ করেছিল। খলিল বললো, স্যার, আপনি থাকলে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মনোবল ফিরে আসবে। জান্তারা কিছু করতে পারবে না। সেনা চেইন অব কমান্ড নষ্ট হবে না। এসব শর্ত সাপেক্ষে যোগ দিলাম।

আপনার যোগদান কোনো লাভ হয়নি এতে ওরাই বরং লাভবান হয়েছে।

একেবারে হয়নি তা নয়। আর্মিরা সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতায় যেতে পারেনি। সংবিধান বাতিল করেনি। জানো তো সংবিধান না-থাকায় পাকিস্তানে গণতন্ত্রের কি বেহাল অবস্থা হয়েছিল।

ওরা কি সংবিধান বাতিল করতে চাচ্ছিল?

হ্যাঁ, আমেরিকা তাই চাচ্ছিল। এ নিয়ে ফারুকের সঙ্গে মোশতাকের ঝগড়া হয়েছে। সংবিধান বাতিল করলে মোশতাক পদত্যাগ করবে বলে হুমকি দেয়।

আমরাও তাই ভেবেছিলাম। মোশতাকের উপর দিয়ে ধাক্কাটা পার দিচ্ছে।

পরে সেটাই প্রমাণিত হলো। আমরা ব্যর্থ হয়ে গেলাম। আসলে বঙ্গবন্ধু হত্যার ধাক্কা এতো ব্যাপক যে সেটা সামলাতেই আমাদের প্রচুর সময় লেগে গেল। সেনারা এমন কাজ করবে বিশ্বাস হতে চাচ্ছিল না।

স্যার, অনেকেই বলছেন যে ফারুকেরা ছিল পাকিস্তানি অ্যাজেন্ট। সিআইএ সে-ভাবেই তাদের একাত্তরে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ ঘটায়।

হ্যাঁ, এখন তো প্রমাণিত হচ্ছে এরা শুধু অ্যাজেন্ট না জল্লাদ।

মোট কথা আমেরিকানরা কখনোই চাইবে না এদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাক। তারা পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হতে দেয়নি, এখানেও সেই অবস্থা করছে।

স্যার, সেনাপ্রধানের চাকরি বৃদ্ধি করা হয়েছে নাটকীয়ভাবে। তার চাকরি বৃদ্ধি করা হবে না বলে প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান ঘোষণা দিয়েছিলেন। এরশাদ সাহেব রাষ্ট্রপতি সাত্তারকে হাইজাক করে সিএমএইচ-এ ভর্তি করেন। তারসঙ্গে কাউকেও দেখা করতে দেননি, এমনকি প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজকে সিএমএইচ-এ ঢুকতে দেননি। অথচ রাষ্ট্রপতি একদম ভালো ছিলেন। জোর জবরদস্তি করে তার কাছ থেকে

ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। এ ঘটনা সিএমএইচ-এর বহুলোক সাক্ষী। আমার বন্ধু মেজর মুজিবর আগাগোড়া নাটকের সাক্ষী। ফলস্ গেজেট নম্বর দিয়ে এরশাদ নিজেই তার চাকরি বৃদ্ধি করেছেনে। তার চাকরি বর্ধিতকরণ অবৈধ। চিঠি স্বাক্ষরকারী অফিসার এবাদতউল্লাহ আমার বন্ধু। পাক জিএইকিউ-তে আমরা একসঙ্গে পিএস পরিদপ্তরে ছিলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম: তুমি কেন ব্যাকডেটে এ পত্রে সই করেছো। সে উত্তর দেয়নি- মিনমিন করছিল। বিনিময়ে এরশাদ তাকে ডিআইটির একটি প্লট দিয়েছেন ?

এতোসব ঘটেছে।

জি স্যার। পনেরো আগস্টের ঘটনার মতোই। আসল ঘটনা কেউ জানতে পারবে না। এজন্য রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদের ব্যক্তিদের চিকিৎসা পিজি হাসপাতালে হওয়া দরকার। সিএমএইচে না। সিএমএইচের ডাক্তারের পিজিতে গিয়ে চিকিৎসা করাবার কোনো বাধা নিষেধ নেই। তাহলে এসব অযাচিত ঘটনা ঘটবে না।

এটা সম্ভব না।

তা-হলে ভবিষ্যতেও এরূপ নাটক হতেই থাকবে ? সে যাক, সেনাবাহিনী কি এখন পাকিস্তান ফেরত অফিসারদের নিয়ন্ত্রণাধীন?

ইয়েস, জিয়া এ-কাজটি করেছিল বলেই এতোদিন ক্ষমতায় ছিল। তবে মুক্তিযোদ্ধারা বেকায়দায় থাকলেও ক্ষমতার লোভে এরশাদের সঙ্গে মিলে আছে।

স্যার, মনে হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে জামাতিদের চাকরিতে নিয়োগ, দেওয়া এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অপসারণ করা হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে দশ বছর পর আর মুক্তিযোদ্ধা কেউ প্রশাসনে থাকবে না। সব জামাতি হয়ে যাবে। তখন এ দেশের অবস্থা হবে ভয়াবহ। জিয়া সেক্টর কমান্ডার, স্বাধীনতার ঘোষক ইত্যাদি নানা ছলছুতায় প্রশাসনে জামাতিরা ঢুকে পড়ছে। দেশের মানুষও আসল ঘটনা জানতে পারছে না। বুঝতে পারছে না। স্বাধীনতার পক্ষশক্তি এভাবে মার খাবে, ভাবা যায় না। আপনারা কিছু একটা করুন।

ভয় হচ্ছে ৫০ বছর পর বাংলাদেশ মুসলিম স্পেন, না হয় এদেশ থেকে যেভাবে হিন্দুরা চলে যাচ্ছে। হিন্দুহীন বাংলাদেশ খুব বিপদজ্জনক হবে।

ওদের ঠেকানোর তো কোনো পথ নেই স্যার। যুবতী হিন্দু মেয়েদের পিছনে লাগে মুসলমান ছেলেরা। পুরো গ্রামের মুসলমানরা পরোক্ষভাবে যেন হিন্দুদের পিছনে কাজ করে। জাত-ধর্মের ভয়ে ওরা ওপারে চলে যাচ্ছে। আমি যখন ক্লাশ ফাইভে পড়ি তখন ৩৭ জন হিন্দু ছেলে ছিল। ওদের মধ্যে ৪ জন মাত্র আছে, বাকি সবাই ওপারে চলে গেছে। গ্রামে গেলে ওদের জন্য মনে খুব কষ্ট হয়।

আমাদের নিজের স্বার্থে সহ-অবস্থানের উপর জোড় দিতে হবে। নইলে আমাদের সর্বনাশ হবে। ভারত কখনো খাতির করবে না। আমাদের বোঝা উচিৎ। ওপার থেকে মুসলমান আসে না, কিন্তু এপার থেকে কেন ওরা যায় ? এজন্য আমাদেরই দায়িত্ব

বেশি। এ-জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের দলাদলি, ঠেলাঠেলি, মারামারি এসব দেখে মনে হচ্ছে তাদের মধ্যে খাঁটি দেশপ্রেমের অভাব।

ঠিক তা নয়। তখনকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক মুসলিমপন্থী মুক্তিযোদ্ধা হয়েছে। তারা তো প্রগতিশীলদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে থাকতে পারবে না।

তাই তারা জিয়াকে শক্তভাবে আগলে ছিল। কারণ তারা জানতো ক্ষমতা এদের হাতে না-থাকলে ওদের পরিত্রাণ নেই।

স্যার, বিবিসি বলেছিল, যে পাক-যুদ্ধবন্দিদের বিচার না করে ফেরত দিতে আপনি সরকারকে বারণ করেছিলেন।

করেছিলাম। সেটা শুরুতে। পরে অবস্থা বদলে যায়, কারণ :

১. চীন-আমেরিকাসহ আন্তর্জাতিক সংস্থা যুদ্ধবন্দিদের বিচারের বিরোধিতা করছিল; বিশ্ব ব্যাংক আর্থিক সাহায্য দিতে অস্বীকার করছিল।
২. এ-দিকে সরকার বিরোধীরাও পরোক্ষভাবে আন্তর্জাতিক সংস্থাকে সমর্থন করছিল।
৩. আটকে পড়া বাঙালি ফেরত আনার জন্য দেশের ভিতর প্রবল চাপের সৃষ্টি করছিল।
৪. একজনের বিচার করলেও আটকেপড়া বাঙালি ছাড়বে না বলে ভুট্টোর ঘোষণা।
৫. যুদ্ধবন্দিরা ভারতে থাকায়, ভারত সরকারও তাদের বিনা বিচারে ফেরত দিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের কৌশল অবলম্বন করে।
৬. ষষ্ঠত, অভিজ্ঞ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভাবে প্রশাসন চালানো খুব অসুবিধা হচ্ছিল। তাই সরকারি কর্মচারীদের পাকিস্তান থেকে ফেরত আনার প্রয়োজন পড়ে।

এসব কারণে বঙ্গবন্ধু সরকার যুদ্ধবন্দিদের বিচার না করে আটকে পড়া বাঙালি ফেরত আনার সিদ্ধান্ত নেয়। সরকারকে সমর্থন না করে আমিই বা ওসব সমস্যা কিভাবে সমাধান করতাম। তবে সিমলা চুক্তি অনুসারে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের পাকিস্তান সরকার করবে শর্তে ছিল এবং সে প্রক্রিয়া ভুট্টো শুরু করেছিল। পাঞ্জাবিরা তথা পাকিস্তান আর্মিরা তা হতে দেয়নি। ওরা বরং নানা ছল-চাতুরি করে ভুট্টোকে ফাঁসি দেয়। আর বাঙালি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার তো চলছিল। পাকিস্তানি অ্যাজেন্ট জিয়া বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে ক্ষমতা দখলে নিয়ে মিথ্যা প্রচারণা চালায়। অতঃপর সব অপরাধীদের ছেড়ে দেয় এমনকি যাদের বিচার হয়ে শাস্তি হয়েছিল তাদেরও। জিয়া নিজে রেডিও/টেলিভিশনে বহুবার এবং বিভিন্ন সেনানিবাসে সৈনিকদের দরবার নিয়ে এবং রাজনৈতিক সভা ডেকে সেখানে বলতেন: "শেখ মুজিব যুদ্ধ বন্দিদের তথা রাজাকারদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। এসব লোককে জেলে রেখে বসে বসে খানা খাওয়ায়ে লাভ কি ? এমনি আমাদের এখন খাদ্য ঘাটতি চলছে।"

যুদ্ধবন্দিদের বিচারের জন্য মেজর জলিল সোচ্চার ছিলেন।

হ্যাঁ, ছিলেন। কিন্তু সোচ্চার থাকলে তো হবে না। ঐসব সমস্যার সমাধানের উপায়ও বের করতে হবে। তোমাদের ফিরিয়ে আনার জন্য প্রতিদিন মিছিল হতো-তাদের তো জলিলরা বুঝালো না যে দেশের স্বার্থে তাদের ফেরত আনতে বিলম্ব হবে। তখন আমাদের আর কোনো উপায় ছিল না। যুদ্ধবন্দিদের ফেরত দিবার পরেও চীন, সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। তারা চাপ দিচ্ছিল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করতে। বঙ্গবন্ধু ওদের চাপে নত হননি। কাজেই বুঝ, তখন আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশ কিরূপ চাপের মুখে ছিল।

স্যার, ১৫ আগস্টের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এমন ক-জনের মুখে শুনেছি বঙ্গবন্ধু হত্যার সংবাদ শোনামাত্র মোশতাক অজ্ঞান হয়েছিলেন।

মোশতাক ক্ষমতালোভী ছিলেন, বঙ্গবন্ধুর প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলেন কিন্তু তিনি বঙ্গবন্ধুর শত্রু ছিলেন না। বঙ্গবন্ধুর হত্যা-উত্তর পরিস্থিতি সিআইএ এমনভাবে পরিচালত করে যে, এদেশের লোক আসল ঘটনা বুঝতেই পারেনি। সেই পরিকল্পনা মোতাবেক মোশতাককে ক্ষমতায় বসানো হয়েছিল। কারণ বাঙালি জাতির কলঙ্কস্বরূপ ঘটনার দায়িত্ব ডার্ক হর্স তার উপর দিয়েই পার করে। কতকগুলি সুনির্দিষ্ট কাজ যা মোশতাককে দিয়ে করানো হয়, তবে সত্য একদিন প্রকাশ পাবেই। বঙ্গবন্ধুর খুনি, মোশতাক, না জিয়া-না সিআইএ।

আপনি তো বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে তেমন কিছুই বলেন নি।

অনেক বলেছি। আমার কথা শুনছে কে ? তাহলে নির্বাচনে জিতলাম না কেন?

নির্বাচন তো আয়ুবী কায়দায় হয়েছে। আপনিই বলেছেন ।

দেশবাসী তার প্রতিবাদ করতে পারতো ? তেমন প্রতিবাদ তো হলো না।

স্যার, আবদুর রাজ্জাকসহ অনেক নেতা মোশতাককে খুনি দাবি করে তার বিচার করে ফাঁসি দিবার দাবি করেন ।

তারা এখনো গোলক ধাঁধায় আছেন। তারা আসল নায়ক কে জানতে পারেনি। আর পারলেও তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে না। এখানেই রহস্য এবং এখানেই আওয়ামীরা মার খাচ্ছেন।

শুনেছি ১৫ আগস্ট জেনারেল জিয়া, ফারুকদের ডি-ব্রিফিং এ উপস্থিত ছিলেন, বিমানবন্দরে সৈন্যদের উৎসাহিত করে বক্তব্য দেন এবং অপারেশনের সময় ২-ফিল্ড রেজিমেন্টের অপারেশন নিয়ন্ত্রণ কক্ষে বসে পুরা অপারেশন পরিচালনা করেছেন।

সে কথা রাজ্জাকদের গিয়ে বলো। ওরা আসল খুনির নাম নিতে শরম করে মোশতাককে দোষী করে মূল খুনিকে প্রটেকশন দিচ্ছে ।

স্যার, জেল হত্যাকারীরা বলছেন মোশতাক নির্দেশ দিয়েছিল ?

মোশতাক বললেই তারা হত্যা করবে কেন ? তার অর্থই দাঁড়ায় তারা হত্যা করে দোষটা মোশতাককের ঘাড়ে চাপায়। আর মোশতাক যদি হুকুম দিয়ে থাকেন তার বিচার করুক ? হত্যা মামলা বিচার কেন বন্ধ করেছে ?

মোশতাকই করেছেন ?

না। মোশতাককে ক্ষমতায় বসানো হয়েছিল হত্যাকারীর পাপ ঢাকবার জন্য। তাছাড়া তিনি তো ক্ষমতায় নেই তবে কেন তার বিচার হচ্ছে না। আর মোশতাক কে? আইন তো ৬ মাস পরে এমনিই বাতিল হয়ে গিয়েছিল। সেই বাতিল আইনকে আইনে পরিণত করলো কে এবং কেন ? রাজ্জাকদের গিয়ে জিজ্ঞেস করো।

তার মানে ইনডেমনিটি বিল বাতিল হয়ে গিয়েছিল ?

ইয়েস।

স্যার, বঙ্গবন্ধুকে ভারত ও সিআইএ মিলে হত্যা করেছে, তবে কি এর সঙ্গে ইন্দিরা জড়িত ?

না। ইন্দিরা মানে ভারত না। ভারতের সবকিছুর জন্যই ইন্দিরা দায়ী নন। ভারতের উগ্রপন্থীরা গান্ধীকে হত্যা করেছিল, সোহরাওয়ার্দীকে হত্যার চেষ্টা করেছিল। পাকিস্তানের ক্ষমতালোভীরা প্রধানমন্ত্রী লিয়াকতকে হত্যা করেছিল। আমেরিকান উগ্রপন্থীরা কেনেডিকে হত্যা করে, মার্টিন লুথারকে হত্যা করে। এই উগ্রপন্থীদের সঙ্গে সিআইএ, ও আইএসআই-এর যোগাযোগ আছে। তারাই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে ।

একজন সফল রাজনৈতিক নেতৃত্ব কখনো কোনো প্রতিপক্ষের নেতৃত্বকে হত্যা করে না। গান্ধীর ক্ষেত্রেও তাই। বঙ্গবন্ধুর প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল। 'র' তাঁর অগোচরে কুকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হয়েছিল বলে মনে হয়।

স্যার, জাতীয় ধ্বনি জিন্দাবাদ করা হয়েছে।

অসুবিধা নেই তবে রণধ্বনি জয় বাংলা হতেই হবে।

অনেক মুক্তিযোদ্ধা জিন্দাবাদ শুনতে পারে না আবার অনেকে জয় বাংলা।

জয় বাংলা মুক্তিযুদ্ধের রণধ্বনি, মুজিবনগর তথা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় ধ্বনি ছিল-জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ।

পাকিস্তান ভক্তদের এসব পছন্দ নয়। জিন্দাবাদ পাকিস্তানিদের জয়ধ্বনি ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের নয়। কিন্তু দেশের মানুষ যেটা গ্রহণ করবে তখন আর বলার কিছু থাকে না। এই ধর, পাক আমলে আমরা যে জাতীয় সঙ্গীত গাইতাম-ওটা মোটেই আমাদের পছন্দ ছিল না, তবুও গাইতাম। কোনো মুক্তিযোদ্ধা যদি জিন্দাবাদ বলে স্বস্তি পায়, তাকে আমার করুণা করা ছাড়া কিছু বলার নাই। মোশতাককে-ও আমি বলেছি। মোশতাকও আমাকে বলেছেন, ওদের সঙ্গে আপনি বাকবিতণ্ডা করবেন না। ওরা মানুষ না, পাষণ্ড। বঙ্গবন্ধু এবং চার নেতাকে আমরা হারিয়েছি। আপনাকে হারাতে চাই না। ওটা মোশতাকের মনের কথা ছিল। কারণ একদিন আমি তাকে, ডালিমকে বলতে শুনেছি- তোরা এসব করলি কেন ? কিয়ামতে কি জবাব দিবি, তোরা সীমারের মতো, তোদের আমি মনে-প্রাণে ঘৃণা করি। ডালিমও শুনেছিল। চুপ করে সরে গিয়েছিল। পাকিস্তান থেকে ফিরে বঙ্গবন্ধু জয় বাংলা, জিন্দাবাদ দুটোই বলেছেন।

স্যার, জিয়ার কবর চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা আনা হলো।

ভালোই হয়েছে। **বঙ্গবন্ধুর মাজার ঢাকা আনার রাস্তা পরিষ্কার হয়েছে।**

এ ব্যাপারে আপনি কিছু করুন-কিছু বলুন।

আমি বললে শুধু হৈ চৈ হবে। সময়-সুযোগে ঢাকায় আনতে হবে। যখন আসবে তখন জাতি ধন্য হবে।

তার মানে জাতি এখন অপূর্ণ ?

তোমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করো। একজন ভিখারীকে জিজ্ঞেস করো।

স্যার, একবার আপনি বলেছিলেন মোশতাক ইচ্ছামত মন্ত্রিসভা গঠন করবেন এবং তাজউদ্দিন প্রধানমন্ত্রী হবেন।

হ্যাঁ, এমন শর্তই ছিল। এমন হলে জিয়া ক্ষমতায় আসতে পারতো না। কিন্তু তাজউদ্দিন বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের কোনো প্রকার সহযোগিতা করতে এবং রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু অবস্থা এমন যে শপথ নিয়ে ঐ পদ ত্যাগ করা সমস্যা ছিল। জান্তারা ভেবেছিল তাজ সহজেই রাজি হবেন। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ, তাই বঙ্গবন্ধু হত্যার কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিতে রাজি হননি। জীবন দিয়েছেন। তাছাড়া সিআইএ তাজকে ক্ষমতায় আনতে বাধা দিতেছিল। আমি চেয়েছিলাম স্পীকারকে রাষ্ট্রপতি করে তাজউদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী করতে। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি।

আপনি ওদের ট্রাপে পড়েছিলেন ?

ইয়েস, আমি তখন বুঝতে পারিনি মোশতাক আগে থেকে জড়িত ছিল।

আপনি তো প্রথম মানতে চাচ্ছিলেন না, পরে কিভাবে বুঝলেন ডার্ক হর্স বঙ্গবন্ধুর হত্যার মহানায়ক।

অনেকভাবে। আগস্টের প্রথম সপ্তাহে খালেদ জিয়াকে স্যাক করার জন্য আমাকে বলেছিলেন। আমরা তা পারিনি বঙ্গবন্ধুর জন্য। বঙ্গবন্ধু সময় নিচ্ছিলেন।

স্যার, নর্থ বেঙ্গলে আপনার কোনো স্মৃতি চিহ্ন নেই।

তুই একটা কিছু কর -- (থামলেন)

যদি সম্ভব হয় আমার গ্রামে আপনার নামে একটি স্কুল করবো।

আমার আশীর্বাদ রইল।

স্যার, কদিন আগে এরশাদ ঢাকায় বলেছেন, মুক্তিযোদ্ধারা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে এখন সবাই বলছেন একই কথা। অথচ গত বছরেও বুদ্ধিজীবীদের দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বলা হয়েছে। **যে কোনো দেশের সৈনিকরা হলেন সে দেশের শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক। বুদ্ধিজীবীরা হলেন দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান।**

স্যার, তিনদিন পরে এরশাদ রাজশাহীতে বলেছেন, একাত্তরে দেশের সব মানুষ মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অংশ নিয়েছেন, তাই তারাও মুক্তিযোদ্ধা। অর্থাৎ দেশবাসী সবাই মুক্তিযোদ্ধা।

তার মানে সাড়ে সাত কোটির সব বাঙালিই মুক্তিযোদ্ধা। এরশাদ একটা ইবলিস। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করছে। কোনোকালেই কোনো দেশের সব মানুষ যুদ্ধ করে না। প্রত্যক্ষ যুদ্ধ না করে কেউ মুক্তিযোদ্ধা হয় না। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে এক লাখ বিশ হাজার সৈন্য অংশ গ্রহণ করেছে শুধু তারাই মুক্তিযোদ্ধা। তাদের তালিকা রয়েছে।

স্যার রুস্তম নামে এক জেসিও আমার সঙ্গে ল পড়তো। সে আসলে জেএসডির সদস্য ছিল। কিন্তু সর্বক্ষণ বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে বলতো এবং জিয়ার প্রশংসা করতো। বগুড়া সিপাহি বিদ্রোহের সঙ্গে সেও জড়িত ছিল বলে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। তেমনি পাক ফেরত হাবিলদার ওয়ালি, দেশে এসে বঙ্গবন্ধুর নানা দুর্নাম করতো এবং জিয়ার খুব ভক্ত ছিল। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের অফিস সেনা ভবনে থাকতো। জিয়ার গণভোট এবং রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে সে একাই যাথাক্রমে ৪৪ ও ৪৬ টি ভোট দেয়। যে কোনোভাবেই জিয়াকে জেতাতে হবে--- এই ছিল তার দর্শন। বগুড়া ঘটনার সময় তারও দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

ওদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে।

ঐ রুস্তম আমাকে বলেছিল, **তাহেরকে ফাঁসি দেওয়ার কারণ, জিয়া যে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত তা তাহের জানত। জিয়ার ভয় ছিল, সে হয়ত তা ফাস করে দিবে।**

হতে পারে তবে কর্নেল তাহেরের ফাঁসিটা খুব দুঃখজনক। একজন পঙ্গু বীরউত্তমকে ফাঁসি দেওয়া ঠিক হয়নি। **তাছাড়া কোনো মুক্তিযোদ্ধা তার যত বড়োই অপরাধ হোক-- জেল হতে পারে ? ফাঁসি না।**

আমরা মাঠ থেকে ফিরে এলাম। স্যালিউট দিয়ে চলে এলাম। এরপর অনেক প্রশ্ন লিখে লিখে রাখলাম কিন্তু কাজের এতো চাপ যে তার কাছে আর যেতে পারিনি। সিএমএইচ-এ গিয়েছিলাম। কাছে যেতে দেয়নি। লন্ডন গেলেন, টিভিতে দেখলাম, মৃত্যুর পর ফিরে এলেন টিভিতে দেখলাম। সিলেটে গিয়ে তার কবর জিয়ারত করতে এখনো পারিনি। কিন্তু তাকে প্রতিদিন মনে করি। আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করুন--- এই প্রার্থনা করি। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবীর ঘোষণা করুন এই কামনা করি এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীতে বঙ্গবীরের জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালন করা হোক। **জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় বঙ্গবীর।**

আমি তখন পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি জিএইচকিউ-তে কর্মরত।

১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ রাতে অনেক বিলম্বে ঘুমানোর জন্য সকালে উঠতে দেরি হয়। ফলে নাস্তা না খেয়ে, পেপার হেডিং না দেখে এবং বেতার সংবাদ না শুনে অফিসে চলে যাই। তাই মনে খুব ক্ষোভ নিয়েই তিন নম্বর গেইটে পৌঁছে নিত্যকার মতো সংবাদ শিরোনাম (ঝং এবং কুহিস্তান) দেখছি। রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়ার কনফিডেনশিয়াল ব্যক্তি বলে পরিচিত এমও পরিদপ্তরের হাবিলদার আফজাল সাইকেল থেকে নেমে আমার ঘাড়ে টোকা মেরে বলে, 'দোস্ত ও পেপার পড়নেসে কুচভি ফায়দা না হোছি'। 'পাঁচ গজ দূরে গোলন্দাজ পরিদপ্তরের সামনে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আস্তে বলে, তেরা পিও আজাদি ডেকলার কর দেছি, আবে তু আজাদ হো ফের এত্থে কি করছি, আব ফোটা খা' (তোমার বাবা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে, আরে তুমিতো স্বাধীন, তবে এখানে কি করছো, এখন হাওয়া খাও)। ওর কথায় আমার শ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। কারণ ১লা মার্চ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা শুনবার জন্য আমরা উদগ্রীব ছিলাম। ওর মুখের প্রতি চেয়ে রইলাম। সে আবার বললো 'আব ত বেটা তুম নেহি বাচ সেকতে'। 'তার পর সে আরো জানালো যে সারা রাত সে অফিসে ছিল। রাত আড়াইটা-তিনটায় ইস্টার্ন কমান্ড (ঢাকা) থেকে সিগন্যাল পেয়েছে, আজ রাতে শেখ মুজিব ইস্ট পাকিস্তানকে আলাদা রাষ্ট্র ঘোষণা করেছে। সেনা অয়ারলেসে তা ধরা পড়েছে। দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। তবে ওখানে এখন সব শান্ত'। আফজালের কথায় বুকটা দুরু দুরু করে। তবে কি বাংলাদেশে কিছু ঘটেছে ? এমও পরিদপ্তরে প্রবেশের পূর্বে সে আবার বললো 'দোস্ত সাবধানে থেকো, বেশি ঘুরাফিরা করনা'। আমি আনন্দ বিষাদে সাইকেল ধরে হেঁটেই চললাম। বারবার মনে হতে থাকে বঙ্গবন্ধু আলাদা রাষ্ট্র ঘোষণা করেছেন, তবে কি ইস্ট পাকিস্তান এখন স্বাধীন ! কি এক আনন্দে বুকটা ভরে গেল। আমি তখন কার পার্কের মাঝখানে জেনারেল গুল হাসানের সামনে পড়লাম।

কেমন যেন কটমট করে তাকালেন। ডিইএমই-এর একেবারে পাশ দিয়ে গেলাম। স্যালিউট নিলেন না। কেমন যেন থমথমে ভাব। যে সব রানার পিয়ন হাত তুলে সালাম দিত আজ তারা যেন আমাকে দেখতেই পেল না। হঠাৎ মনে হলো এরা আগরতলা কেসের মতো কিছু আবার করছে না তো ? সাইকেল রেখে অফিসে ঢুকতেই দেখি সুপারিন্টেনের টেবিলে ভিড় করে সবাই যেন কি দেখছে। আমিও দাঁড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করি। মেজর আসলামের পিয়ন সফি আমাকে দেখে একটু সরে দাঁড়াল। মাঝে মাঝে দেখা যায়। কিন্তু পড়া যায় না। এ সময় আমার কোর্স মেট পাঠান নায়েক

লতিফ হাত উঁচু করে এক বিশেষ ভঙ্গিতে জোরে জোরে বলে "Big bird is in the cage others not in their nests." এক জনকে ধরে কি করবে? শেখ সাহেব আসলি কাম কর চোকে, ওসমানী ভাগ গেয়ে। লতিফের ঐ ভঙ্গিটা আমাকে আজও পুলকিত করে। সুবেদার সুলতান কার যেন ইঙ্গিতে আমার উপস্থিতি টের পেয়ে চিৎকার করে বললেন, আপনারা নিজ নিজ টেবিলে যান, এখানে ঘাপলা করবেন না- যান যান কাজ করুন। আমার টেবিলে পৌঁছতেই দেখি একটি ছোটো সিগন্যাল বার্তা All 13 ACC Pers killed. কুমিল্লার ৫৩ ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারের ১৩ জন বাঙালি কেরানিকে হত্যা করা হয়েছে। বুকটা চিন চিন করে উঠলো। সবাই আমার পরিচিত! সুবেদার মেজর ফারুক, নায়েক কুদ্দুস মাত্র কিছু দিন আগে সেখানে গেছেন। ফারুক সাহেবের একমাত্র ছেলে তার সঙ্গে থাকতেন। পরে জেনেছি পিতার সঙ্গে ছেলেও শহীদ হয়েছে। কুদ্দুসের স্ত্রী চাকলালা বাঙালি স্কুলে মাস্টারি করে। স্ত্রীকে রেখে কুদ্দুস যেতে চাচ্ছিল না। আবার তার স্ত্রীও চাকরি ছেড়ে যেতে পারে না। ওদের ছোটো একটি মেয়ে। ভাবির মা-বাবা পিন্ডি চাকলালাতেই থাকেন। গত ডিসেম্বরে আমার ঘরে বসেই কুদ্দুসের সঙ্গে কত আলাপ করি! সিগন্যাল বার্তা বারবার পড়লাম। বিশ্বাস হতে চায় না। অপারেশন সার্চ লাইটের প্রথম ক্যাজুয়্যালিটি প্রতিবেদন। চোখ আমার ঝাপসা হয়ে আসে। এতগুলো আপনজনের মৃত্যু সংবাদ-বুকের মধ্যে হু হু করা শব্দ যেন আমি শুনতে পাই। বিশাল ঘরের মধ্যে তাকালাম। সবাই কাজ করছে শুধু গুজরাটের হাবিলদার শের খান আমার দিকে তাকিয়ে আছে। হাত ইশারা করে বাইরে গেল। আমিও গেলাম। ও বললো ইস্ট পাকিস্তানের অবস্থা ভালো না। আপনি কি কর্নেল এম আর চৌধুরীকে চিনেন ? একটু চিন্তা করে বললাম, যদি তিনি ৪ ইস্ট বেঙ্গলের অফিসার হন তাহলে চিনি ! কেন ?

গত রাতে মারা গেছেন। আমিও চিনি। বড়ো ভালো মানুষ ছিলেন। আমরা কোয়েটা একত্রে ছিলাম। বুকটা আমার আবার মোচড় দিয়ে উঠল। শের খান বললো, তার পরিবারের জন্য মৃত্যু আনুতোষিক এবং সাধারণ পারিবারিক ভাতা দিতে হবে। আপনি কি নোট লিখে দিবেন। বললাম দিব। আচ্ছা কাকেও কিছু বলবেন না। আমরা অফিসে ফিরে এলাম। মনের মধ্যে আশংকা হলো, তাহলে কি ইস্ট পাকিস্তানে সব বাঙালি সেনাদের এরা মেরে ফেলেছে নাকি ? পাশেই নোয়াখালীর নায়েক ক্লার্ক ফারুক বারবার তাকাচ্ছে, কিন্তু কিছু বলছে না। নয়টার দিকে নাস্তা খাবার ক্যান্টিনে গেলাম। পাঞ্জাবি-মোহাজেররা হৈ চৈ করছে। বেশি করছে ইউপি-সিপিরা। পিএ পরিদপ্তরে পিওন দিত্তার আওয়াজ ভেসে এলো-বেঙ্গল ফাতাহ হো গেয়ে -হামারা ফৌজনে কামাল কর দেয়ে। একজন অন্য জনকে ধন্যবাদ দিচ্ছে। টিকে বাহাদুর হায়। আমার প্রতি নজর পড়ায় একে অপরকে হাত ইশারায় ওরা চুপ করে। অফিসে ফিরে এলাম। আজ ডাকাডাকি নেই। সব অফিসার মিটিং-এ গেছে। সকাল থেকে দেখছি অন্যান্য পরিদপ্তর থেকে লোকজন আসে কিন্তু চুপচাপ আলাপ করে চলে যায়। এক টেবিল পরে কোর্সমেট লতিফ। মাঝখানে বেলুচ রেজিমেন্টের ক্যামবেলপুরের নায়েক রমজান।

দেশের সমস্যা নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক বাকবিতণ্ডা হয়। আজ ওরাও চুপচাপ। শের খান একটা ফাইল দিল। মেলে দেখলাম- লেঃ কর্নেল এম আর চৌধুরীর ক্যাজুয়ালটি রিপোর্ট। "কিল্ড অ্যাট ২৫২৩৫৫"। অপারেশন সার্চ লাইট বারোটার পর শুরু হয়েছিল। কিন্তু তাকে তার আগেই হত্যা করা হয়। বিস্তারিত কোনো তথ্য নেই। বুঝলাম এটা ওয়ার ক্যাজুয়ালটি। লিখে দিলাম। ৪ ইস্ট বেঙ্গলের অফিসার। ১৯৬৪ সালে কুমিল্লাতে ব্রিগেড অফিসে কয়েকবার দেখা। রাজশাহীতে বদলি যাবার সময় ক্যাপ্টেন এ এস এম মোস্তাফিজুর রহমানকে (পরবর্তীকালে বাংলাদেশ স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী) বলেছিলেন চোখ কান খোলা রাখবে। এ-শালারা আমাদের শেষ করার প্লান করেছে। আমাকে বললেন, সাবধান থেকো। ইয়াসিনের (ডিকিউ) সংগে যোগাযোগ রেখো। আবার দেখা হবে। না তার সংগে আর দেখা হয়নি। কিন্তু তার কথাগুলো সবসময় কানে বাজতো। সংযুক্ত এমএস শাখার ফাইলে তাঁর স্ত্রী-সন্তানদের ছবি দেখলাম। বারোটার দিকে খবর এল আজ বিকালে অফিস হবে। এখনি গিয়ে খেয়ে আসতে হবে। প্রায় সবাই চলে গেল। দু-চার জন থাকলো। আমি গেলাম না। কারণ, মেসে আমাদের খাবার ব্যবস্থা এখন হবে না। বাঙালি নায়েক ফারুক, নায়েক ওয়াসি, হাবিলদার (বাংলাদেশে সুবেদার) আতাউর রহমান এবং হাবিলদার (বাংলাদেশে সুবেদার মেজর) মোসলেমউদ্দিন ভূঁইয়া বাসায় খেতে গেলেন। আতার বাসা খুব কাছে। আতা খেয়ে আমার জন্য খাবার আনে। খাবার সময় আমার কাছে বসে খুব আস্তে বললো, দেশে নাকি যুদ্ধ শুরু হয়েছে। সকালে ঢাকার খবরে বলেছে এরা শেখকে ধরেছে। সকালে বিবিসি শুনেছেন ?

না ভাই। আজ উঠতে খুব দেরি হয়।

এরা ঢাকাতে হাজার হাজার লোক মেরেছে। শেখ সাহেব ইস্ট পাকিস্তানকে আলাদা রাষ্ট্র ঘোষণা করেছেন। ওসমানীকে মেরে ফেলেছে। এখন কি হবে? আপনার ভাবি খুব কাঁন্নাকাটি করছে।

আমি কিছু বললাম না। এমন কি সকালে আফজালের বলা কথাও না। কর্নেল এম আর চৌধুরীর মৃত্যুর কথাও না। আতা আবার বললো, আপনার ভাবি সকালে ঢাকার খবর শুনেছে। ওরা শেখ সাহেবকে ধরেছে।

বললাম, দেখা যাক কি হয়। এক ফাঁকে নায়েক ওয়াসি এসে জানাল, স্যার দেশে কিছু একটা ঘটেছে।

লক্ষ লক্ষ টাকার চেক ইস্যু হচ্ছে আমাকে দেখতে দিচ্ছে না।

নায়েক ফারুক খেয়ে এসে আস্তে বললো, এই মাত্র আকাশবানী শুনে এলাম, ইস্ট পাকিস্তানে এরা হামলা করেছে।

হাঙ্গামায় হাজার হাজার লোক মারা গেছে। শেখ সাহেব ও ওসমানী মারা গেছে।

বললাম, বিবিসি শুনলে সব জানতে পারব। এখন এ-সব আলাপ না-করাই ভালো।

আমরা অফিসে রয়েছি কিন্তু তেমন কাজ নেই। বেতন শাখার কাজ হচ্ছে। বাকি সবাই বসে বসে পেপার পড়ছে অথবা গল্প গুজব। আমার মন ও কান সব সময় খাড়া কিন্তু সারাদিন এদের কাছে কিছুই জানতে পারলাম না। সন্ধ্যার আগে হঠাৎ একটা কাণ্ড হলো। হিসাব শাখার দেয়ালে এশিয়ার একটা মানচিত্র লাগিয়েছে । প্রায় সবাই তা দেখছে। চীন, ভারত, বাংলাদেশের অবস্থান আলোচনা করছে। এবার খোলাখুলি বলতে শুরু করেছে। ভারত যদি আক্রমণ করে তাহলে চীন কতক্ষণের মধ্যে বাংলাদেশে আসতে পারবে তারই হিসাব-নিকাশ। পাঠান লতিফ ক্ষেপে গেল, বললো চীনের আর কাজ নেই। নিজের খেয়ে পরের রোগ সারাবে। চীন কোনোদিন দেশের বাইরে যায়নি। এবারও যাবে না। তাদের উপর নির্ভর করলে পাকিস্তান ডুববে।

সুবেদার সুলতান বিজ্ঞের মতো বললেন। ভুট্টোর সঙ্গে চৌ এন লাই-এর কথা হয়েছে। চীন সাহায্য করবে। চীনকে ভারত খুব ভয় করে।

লতিফ বললো, চৌও-এর সঙ্গে শেখ মুজিবের বন্ধুত্ব অনেক আগের। ভুট্টো রাজনীতিতে তখন নাবালক ছিলেন। তাছাড়া চীন-এর বর্ডারে লক্ষ লক্ষ রাশিয়ান ফৌজ রয়েছে।

লতিফের কথায় সব চুপ করলেন। মনে মনে হাসলাম। সন্ধ্যার পর ছুটি হলো। বাসায় ফিরলাম। মিস আকতার (বাড়িওয়ালার মেজো মেয়ে) বারন্দায় ছিল। বললো, এতো দেরি যে। ওকে সব বললাম। মৃদু হেসে উঠে ভিতরে গেল। ওর ছোটো বোন রুখসানা এসে বললো, আম্মা জানতে চান দুপুরে আপনি খেয়েছেন কিনা।

বললাম খেয়েছি। একটু বিশ্রাম নিলাম। আফজাল, লতিফ এবং আতার কথা মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। শহীদ কুদ্দুছের জন্যে মনটা আনচান করলো। ওর বাচ্চাটার জন্য মন খুব কাতর হলো। এমন অবস্থায় রেকর্ড অফিস থেকে কুদ্দুছের স্ত্রীকে তার মৃত্যু সংবাদ জানাবার কথা। জানিয়েছে কিনা তা জানবার ইচ্ছে হলো। তা-ছাড়া আমার বন্ধু নূর মোহাম্মদ পিআইএ'র প্রকৌশলী চাকলালা গ্রেসি লাইনে থাকে। ওদের জন্য মনটা খুব উতলা হলো। ঘরে তালা লাগিয়ে সাইকেল চাপলাম। শীতের রাত। রাস্তা একেবারে ফাঁকা ফাঁকা লাগলো। ওখানে পৌঁছলাম রাত সাড়ে আটটায়। ওরা টিভি দেখছিল। আমাকে দেখে খুব আনন্দিত হলো।

কাকু আপনি এতো রাতে এলেন ভয় করলো না।

না মা। কুদ্দুছের মেয়েকে কোলে নিয়ে আদর করলাম। ভাবি বললো এখানে সবাই খুব ভয় করছে। বাঙালিরা বলাবলি করছে পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ হচ্ছে। শত শত লোক নাকি ভারতে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেলেছে। তাই শুনে বাবা শুধু কাঁদছেন।

বঙ্গবন্ধু বেঁচে আছেন।

তাই ! আল্লাহ যেন তাঁকে হেফাজত করেন। ভাবির চোখে জল এলো। ওর বাবা আমাদের ছেড়ে যেতে চাচ্ছিল না। একপ্রকার জোর করে পাঠালাম। ভাবলাম একবার দেশে থেকে আসুক। এখন দেখছি কোনোখানেই নিরাপদ নয়।

কেন ভাবি ?

একটু আগে আকাশবানী শুনলাম। বাঙালি-পাঞ্জাবি যুদ্ধ হচ্ছে। এখানে আজ কোনো বাঙালি ঘর হতে বের হচ্ছে না। বাবা অফিস থেকে ফিরে ঘরে শুয়ে আছেন। কারো সাথে কথা বলছেন না। স্কুল থেকে ফিরার সময় কেমন যেন ভয় লাগলো। আমাদের কিছু হবে না তো ? ভাই এরা যে নিষ্ঠুর।

কাকু আমার বাবা এখন কি করছে ?

তোমার বাবা এখন ঘুমাচ্ছে।

না! আমার আম্মু বলেছে, আব্বু দাদুর বাড়ি গেছে।

বদদা বঙ্গবন্ধু সত্যিই বেচে আছেন ?

হ্যাঁ ! ভাবি তাকে মারতে পারবে না ।

পাঁচ মিনিট থেকেই চলে এলাম। ওদের সঙ্গে কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। সোজা ট্রান্সভাটা চলে এলাম। নূর কিংবা কোনো বাঙালির বাসাতেও গেলাম না। খেতে যেতে ইচ্ছা হলো না। শুয়ে পড়লাম। রেডিও আস্তে অন করলাম। ইয়াহিয়ার ভাষণের উপর ব্যাখ্যা হচ্ছে। শেখ মুজিবকে শাস্তি পেতেই হবে। বুকটা মোচর দিয়ে উঠল। আফজালের কথাটা মনে হলো। এখন তো বেটা তোমরা বাঁচতে পারবে না। তবে কি সে বঙ্গবন্ধুর কথা বলেছে যা ইয়াহিয়াও তার ভাষণে বলেছেন। দরোজায় মৃদু টোকা। খুললাম। বাড়িওয়ালার মেয়ে রেহানা ও আক্তার। রেহানা হেসে বললো, আম্মা জানতে চাচ্ছেন আপনি খেয়েছেন কিনা। খেয়েছি, ধন্যবাদ, মিথ্যা বললাম। ওরা চলে গেল। একদিনে এরা আজ দুবার খোঁজ নিল। সচরাচর এমন হয় না। সবকিছু কেমন যেন লাগছে। বলতে গেলে সারা রাতই রেডিও শুনলাম। সব খবরের সারমর্ম ঢাকার অবস্থা ভয়াবহ। পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা অস্বাভাবিক। শেখ মুজিবের সঠিক খবর কেউ জানে না। ২৭ মার্চ বিবিসি শুনলাম। রেডিও অস্ট্রেসিয়া ও আকাশবানীর বরাত দিয়ে জানাল যে, বঙ্গবন্ধু ইস্ট পাকিস্তানকে আলাদা রাষ্ট্র ঘোষণা করেছেন। বাঙালি মুক্তিফৌজ গঠিত হয়েছে। ওরা পাকবাহিনীর সঙ্গে সারা দেশে যুদ্ধ করছে। বঙ্গবন্ধুর সঠিক অবস্থান কেউ জানে না। বিবিসি সংবাদ প্রবাহে Evening News, London, ২৬ মার্চ ১৯৭১ এর বরাত দিয়ে জানাল যে, রেডিও পাকিস্তান ঘোষণা করেছে। শেখ মুজিবর রহমান ইস্ট পাকিস্তানের জন্য স্বাধীনতা ঘোষণা করার ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে তাঁর ধানমন্ডির বাসা থেকে আটক করা হয়েছে।

অফিসে যাবার জন্য বের হলাম। নিত্যদিনের মতো সকাল ৭টা ২২ মি সেনাসদর এমও গেটে পেপারের হেডিং দেখছি। আফজাল এসে ঠাট্টা করে বললো, বাংলা দোস্ত তোম লোক স্বাধীন হো গেয়ে আব এহাছে ভাগ যাও। সালা লোক স্বাধীন মাংতা হ্যায়। হাসতে হাসতে ও চলে গেল। অফিসে পৌছার কিছুক্ষণের মধ্যে শের খান জানালো যে, কর্নেল চৌধুরীর মৃত্যু আনুতোষিক মঞ্জুর হয়েছে।

পাঠান হচ্ছে। বেলা দশ ঘটিকার সময় আইএসপিআর-এ কর্মরত মোকতার (বাংলাদেশেও ফটোগ্রাফার হিসাবে আইএসপিআর-এ কর্মরত) এসে জানাল যে, "পাঞ্জাবিরা বলাবলি করছে, বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা রাষ্ট্র ঘোষণা করায় তাকে আটক করেছেন। তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা হচ্ছে। দ্রুত বিচার করে ফাঁসি

দিবে। ওখানে যুদ্ধ চলছে। পাক সেনা অনেক মারা গিয়াছে। বেঙ্গলের এক মেজর বিদ্রোহ করেছে।"

মোকতার চলে যাওয়ার পর কুষ্টিয়ার সুবেদার আফতাব (সেন্ট্রাল অফিসার্স রেকর্ড অফিস কোরোতে কর্মরত) এসে বললেন, বিবিসি বলেছে বঙ্গবন্ধু আলাদা রাষ্ট্র ঘোষণা করেছেন। বেঙ্গলের মেজর জিয়া বিদ্রোহ করেছে এবং সব পাঞ্জাবিদের হত্যা করেছে। কোরোতে বাঙালি অফিসারদের ডুসিআর আলাদা করা হচ্ছে। দেশে এখন যুদ্ধ চলছে। কোনো খবর-টবর আছে কিনা। তাকে কিছু বললাম না। কারণ লোকটা দো-মুখো। তিনি চলে যেতেই সুবেদার মেজর (সুপারিনটেনড্যান্ট) হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন, দাদাভাই তোমাকে পরিচালক ডেকেছেন। তখন বারোটা। সবাই খাবার খাচ্ছেন। আজ আতার বাসায় খাবার কথা ছিল। আমি যেতেই ব্রিগেডিয়ার কাজী ইফতেখার আহমেদ খুব নরম সুরে কুশলাদি জিজ্ঞেস করে আমাকে অপারেশন পরিদপ্তরে গিয়ে একটা চিঠি আনতে বললেন। আমি অবাক হলাম এই ভেবে যে এ যাবৎ এমন ঘটনা ঘটেনি। এমও পরিদপ্তরে বাঙালিদের প্রবেশাধিকার নিষেধ। আমি ১৯৫৮ সাল থেকে ঘুরে ফিরে সেনাসদরে কাজ করছি। কিন্তু একদিনও এমআই, এমও এবং সিগন্যাল পরিদপ্তরে যাইনি। বন্ধু-বান্ধব কেউই সেখানে যাবার জন্য বলেনি। যে দুইজন বাঙালি ছিদ্দিক (পরে মেজর) ও হাবিলদার জলিল (পরে সুবেদার মেজর) সেখানে গত তিন বছর ধরে কর্মরত তারাও না, এমনকি ওসমানী সাহেব যখন ছিলেন তার মেস থেকে কাগজ চিঠিপত্র এনে টাইপ করে দিয়েছি। কিন্তু কোনো দিন তিনি অফিসে যেতে বলেননি, সেই এমও পরিদপ্তরে আজ যাব ? কয়েকটি মুহূর্ত অনেক ভাবলাম।

দেশে এই অবস্থা আর আমাকে পরিচালক এমও পরিদপ্তরে চিঠি নিতে পাঠাচ্ছে। চিঠি তো তারাও তাঁকে পাঠাতে পারে। একটু চিন্তিত মনে সেখানে যেতেই সুপারিনটেনড্যান্ট আমাকে বসতে বলে ভিতরে চলে গেলেন এবং তিন চার মিনিট পরে ফিরে এসে একটা বড়ো খাম দিতে দিতে বললেন ভাইয়া আপ মেজর জিয়া কো জানতে হো। বললাম না, নাম-ও শুনিনি। তিনি বললেন, মেজর জিয়া রিভোল্ট করকে গাদ্দারী করছে। আমি কোনো কথা না বলে চলে এলাম। কিন্তু ভাবনায় পড়লাম এমও পরিদপ্তর থেকে চিঠি নিয়ে আসছি অথচ তারা আমার কোনো স্বাক্ষর নিলেন না। খামটা হাতে নিয়ে পরিচালক মৃদু হেসে বললেন রহমান তোমাকে বোধহয় আমার সঙ্গে প্রতিদিন ঘণ্টা দুই কাজ করতে হবে। আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। তিনি বললেন কিছু বাংলা লেখা ইংরেজি অনুবাদ করতে হবে। আমি মাথা নাড়লাম। সেই ১৯৫৮ সাল থেকে রাষ্ট্রপতির ভবন/প্রধান সেনাপতির ভবন থেকে মাঝে মাঝে আবেদনপত্র নিয়ে একজন অফিসার পরিচালকের রুমে বসে থাকেন আমি অনুবাদ করে দিই। কোনোদিন ভুল শুদ্ধ নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি। এসব আবেদনপত্রের ফলাফল কি হয়েছে তাও জানতে পারিনি। তবে পরিচালক আমাকে স্নেহ করতেন, বিশ্বাস করতেন। সে জন্য তার ব্যক্তিগত কিছু কাজ পিএ কে না দিয়ে আমাকে দিয়ে করাতেন।

আজ সন্ধ্যার আগে ছুটি হলো। আল হেলাল অফিসের সামনে মোকতারের সঙ্গে দেখা। খুব খুশি খুশি ভাব। চলতে চলতে বললো, স্যার মেজর জিয়া বিদ্রোহ করেছে। তার ইউনিটের সব বাঙালি মেরে ফেলেছে। এরা তারে খুব গালাগালি করছে। আপনি শুনেছেন ? বললাম না।

রাত সাতটায় শের খান আমার কাছে এল। কথায় কথায় বললো, মেজর জিয়া ২৫ তারিখ রাতে আট বেঙ্গলের সৈন্যদের নিয়ে বিদ্রোহ করেছে। লোকটা গাদ্দারী করেছে। তবে শের খান কর্নেল এম আর চৌধুরীর জন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করলেন। বললেন, উনি বাঙালি না হলে এতোদিন ব্রিগেডিয়ার হতেন। শের খান চলে গেছে। বাড়িওয়ালা ভিতরে ডেকে নিলেন, গল্প শুরু করলেন। তারা পুরা পরিবার আমার পাশে বসলেন। রেডিও চলছে কিন্তু ওদের জন্য বিবিসি শুনতে পারলাম না। রাতের খাবার ওদের সঙ্গে হলো। মেজো মেয়ে শ্যামা (জামাতি ছাত্রী) বললো, শেখ মুজিব ইস্ট পাকিস্তানকে আলাগ রাষ্ট্র ঘোষণা করে রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধ করেছেন। বললাম, কিন্তু সারা বিশ্বের বাঙালিরা খুব খুশি হয়েছে। তারা এমনই একটা ঘোষণা আশা করছিল। শেখের বিচার হলেও সরকার তার কিছু করতে পারবে না। কর্তা উল্লসিত হয়ে বললেন, ঠিক বাত হ্যায়।

চলে আসবো-গৃহকর্ত্রী আমার হাত ধরে ছাদে গেলেন। আস্তে বললেন, ব্যাটা রাতে রেডিও শোন না। গতকাল রাতে দু-জন লোক জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের আমি দু-বার দেখেছি। গোয়েন্দা হবে বোধহয়। বলে আমার গায়ে মাথায় হাত বোলালেন। আমার কেমন যেন ভয় ভয় লাগল।

২৮-মার্চ ভোরে জানালা খুলে দেখি সিকিউরিটির ইনেসপেক্টর খুরশিদ সাহেব আমার রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। ভয়ে আমি খবর না শুনে একটু সকালে বের হলাম। এমও গেটে পেপার দেখছি। আফজাল এসে বললো, "দোস্ত ও সব না পড় সব ঝুটা হ্যায়। চলতে চলতে বললো, মেজর জিয়া ভি স্বাধীন মাঙ্গতা। ও ভি বাঘাওয়াত কিয়া তেরা লোক কি করছি, সব ছালা পাগল হো গেয়ে। বললাম, তোমরা ভি পাগল হয়ে গেছ। কাল নাকি মদ খেয়ে ইয়াহিয়া খাঁ নেংটা হয়ে ছিল। মাথা নেড়ে আফজাল হাসতে হাসতে চলে গেল। কিন্তু হঠাৎ খুব চিন্তিত হলাম এই ভেবে যে, ইয়াহিয়াকে এভাবে গালি দেওয়া ঠিক হয়নি। আফজাল যদি কমপ্লেন করে তাহলে আমার গতি নেই। তাই চিন্তিত মুখে অফিসে ঢুকতেই জানতে পারলাম, আজ সারা রাত কাজ হয়েছে। বাঙালি কেউ আসেনি মানে তাদের জানানো হয়নি। একটু পরে শের খান জানাল যে, কর্নেল চৌধুরীর পেনশন বাতিল হয়েছে। সে খুব দুঃখ করে বললো যে, বেগম সাহেবা ও ছেলেরা অর্থাভাবে কষ্ট পাবেন। সে আরো জানাল যে, তোমাদের এক বাঙালি গাদ্দারী করেছে। শের খানের কথা শুনে মন খুব খারাপ হয়ে গেল। তেরা এক শালা বাঙালি গাদ্দারী কিয়া।

সেদিন অফিসেই হাবিলদার সুলতান, নায়েক লতিফ, নায়েক রমজান, নায়েক আরিফ প্রমুখ সবাই বলাবলি করলো, তোমাদের দেশে দুই দল হয়ে গেছে। একটা মুজিবের একটা জিয়ার। মুজিব জননেতা কিন্তু জিয়া মার্শাল রাষ্ট্রপতি। ওরা খুব হাসাহাসি করলো। বেলা এগারোটার দিকে সুবেদার মেজর (সুপারেন) আমাকে

পরিচালকের নিকট যেতে বললেন। আমি গেলাম। তিনি আমাকে পিএস পরিদপ্তরে গিয়ে একটা পত্র আনতে বললেন। আমি গেলাম। পরিচালক আমাকে একটা ফাইল দিলেন। আমি এজির অফিসের পাশ দিয়ে আসছি ওয়েলফেয়ার পরিচালক ব্রিগেডিয়ার খোদাদাদের সামনে পড়লাম। তিনি কটমট করে তাকালেন। সেখানেই ইউপির অ্যাসিসট্যান্ট ওয়াহিদ ডাক দিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করে বললেন, দাদা মেজর জিয়া শেখ মুজিবকো বাতিল করকে খোদ সদর বন গেয়ে। বাঙালি সৈন্যরা শেখ মুজিবকো মানতা নেহি ত আব আপকা লিডার কোনো হোগা - মুজিব -জিয়া-ইয়া ইন্দিরা। ওকে ঠাট্টা করে বললাম, আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর না লিলেও চলবে। তো বাঙালিদের নেতা খোদ আল্লাহ।

মেজর জিয়া কে ? জানার জন্য মনটা খুব উদগ্রীব হলো। কেমন যেন জানা জানা নাম অথচ মনে পড়ে না। গত দু-দিন ধরে পাঞ্জাবিদের মুখে মেজর জিয়ার নাম বার বার শুনেছি। মেজর জিয়া বিদ্রোহ করেছে। মেজর জিয়া গাদ্দারি করেছে । মেজর জিয়া বেঈমান, মেজর জিয়া পাঞ্জাবি সৈন্যদের মেরেছে। মেজর জিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং মেজর জিয়া শেখ মুজিবকো বাতিল করে নিজে রাষ্ট্রপতি হয়েছে। মেজর জিয়ার শেষের কাজটি যেন তাদের খুব পছন্দ হয়েছে। একসময় আমি হাবিলদার ভুঁইয়াকে তাঁর কথা জিজ্ঞেস করলাম কিন্তু তিনি কিছু বলতে পারলেন না। আতাকে জিজ্ঞেস করতেই বললো, বেঙ্গলের লোক। আগরতলা মামলায় সরকার পক্ষে ছিলেন। শুনেছি অনেক ছেলেকে মারধর করেছেন। সেই লোকই নাকি এখন বিদ্রোহ করেছে। শের খানের সঙ্গে ক্যান্টিনে চা খেতে বসে মেজর জিয়ার কথা জানতে চাইলুম। ও কেমন যেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো, হবে হয়ত কোনো মহাজের, বাঙালিও হতে পারে। ইপি সিপিও হতে পারে। খোঁজ নিয়ে জানাবে। তিনটার পর ছুটি হলো। বাসায় ফিরে কাপড় বদল করেই বেগম খালেদের ফার্মেসিতে গেলাম। মেজর জিয়ার কথা বলতেই তিনি বললেন। ইয়েস আই নো হিম হি ইজ মাই সিনিয়ার বাট হি ইজ দেয়ার ম্যান। তিনি ব্যাটালিয়ান নিয়ে বিদ্রোহ করলে একটা বড়ো কাজ হয়েছে, তাহলে স্বাধীনতা যুদ্ধ ভালোভাবে শুরু হয়েছে। দেশ স্বাধীন হবেই তা দশ বিশ বছর লাগলেও। এটা একটা শুভ সংবাদ। চিয়ার আপ।

সন্ধ্যার পর আমি আর এ বাজার শওকত সাহেবের (বাংলাদেশে তিনি সিএসও-ওয়ান হয়েছিলেন) বাসায় গেলাম। তাঁকে সব বললাম। তিনি বললেন আকাশবানী বিবিসি থেকে মেজর জিয়ার বিদ্রোহ তার বেতার ঘোষণা এবং নিজে রাষ্ট্রপতি হবার খবর শুনেছেন। তিনি আরো বললেন যে, শুনেছি মেজর জিয়া পাক সরকারের আইও ডিউটি করেছেন, এনএসএফ গঠনে জড়িত ছিলেন। আগরতলা মামলায় এবং সত্তরের নির্বাচনে পাকআর্মির পক্ষে কাজ করেছেন। তিনি এদের খুব বিশ্বাসী। এখন আবার নিজে রাষ্ট্রপতি হলেন। সে সংবাদে এরা খুব খুশি হয়েছে। ব্যাপারটা ঘোলাটে লাগছে। সারা দেশ একদিকে আর তিনি একদিকে, তা হয় কি করে। তবে কি তিনি এদের

(পাকিস্তানিদের) পক্ষে কাজ করছেন ? আমি তার কথায় অবাক হলাম। বললাম, স্যার, এরা তারে খারাপ ভাবে গালিগালাজ করছে। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, তাই বলে নিজে রাষ্ট্রপতি হন কিভাবে? তাকে কেউ মানবে না। মানতে পারে না। Who the hell he is to become the President of Bangladesh আমি চা খেয়ে লগ এরিয়া গেলাম সুবেদার আবদুল লতিফের বাড়ি। তিনি কর্নেল গিয়াসের বাবা। তাঁকে মেজর জিয়ার কথা বললাম। তিনি বললেন, এক জিয়া আছে বেঙ্গলের কিন্তু তিনি খুব ড্যাঞ্জারাস। এরা যখন বলছে তখন ঠিকই হবে। এদের তো সিআইএ সাহায্য করছে। এদের হয়েও কাজ করতে পারেন। গোয়েন্দাদের বিশ্বাস নেই। মেজর জিয়ার অনেক কিছু জানি। তিনি তোমার জেলার গাবতলি থানার বাগবাড়ি গ্রামের লোক, ভালো বাংলা বলতে পারে না। খুব সম্ভব তারা ওপারের লোক। তার বাবা করাচি মোহাজের কলোনির সেটল্ড। ডালডা বাঙালি। পাঞ্জাবিদের খুব বিশ্বাসী। এরা তাকে দিয়ে বাঙালিদের বিরুদ্ধে অনেক কাজ করিয়েছেন। আমার কথা বিশ্বাস না হয় ফসিউল আলমকে জিগাইও। উনি তার সঙ্গে সার্ভে ইউনিটে কাজ করেছেন। গোয়েন্দারা নানারূপ ধরে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছবি দেখ না। টিভিতে তখন একটা মহাযুদ্ধের সিরিজ চলছিল। বললাম, ওস্তাদ বর্তমান অবস্থায় কোনো বাঙালি কি পাঞ্জাবিদের সঙ্গে থাকতে পারে। এ কথায় উনি একটু রাগ করে বললেন, পারে, টিভির ইংরেজি ছবিটা দেখ। গোয়েন্দারা সবকিছু করতে পারে। আমিও শুনেছি, তিনি বিদ্রোহ করেছেন। কোরোতে তার ডকুমেন্ট আলাদা করা হয়েছে। কিন্তু তাকে বিশ্বাস করি না। লতিফ সাহেবের কথা শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। প্রায় আড়াই মাইল পথ পায়ে হেঁটে অনেক অলিগলি অতিক্রম করে তার কাছে গিয়েছিলাম। ভাবলাম শেখ সাহেব যদি বন্দি হন, নেতারা লুকিয়ে থাকেন, তাহলে মেজর জিয়া বিদ্রোহ করে রাষ্ট্রপতি হলে ক্ষতি কি। পথে মাল রোডে সিপাই মফিজের সঙ্গে দেখা। বলল, বদদা যুদ্ধ শুরু হয়েছে।

সব বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করেছে। ওরা পাঞ্জাবিদের কচুকাটা করছে। এখানে এখন থেকে লাভ নেই। চলে যাব। সিন্ধুর ফিরোজ বললো, ইতিমধ্যে ১৫ জন অফিসারকে মেরে ফেলেছে। আমার হাতে চাপ দিয়ে দ্রুত চলে গেল। বাসায় ফিরে আকাশবানী শুনতে লেগেছি, শ্যামা আর রেহানা এসে বললো, ভাইয়া আকাশবানী শুনবেন না ওরা মিথ্যা বলে। আমি রেডিও বন্ধ করলাম। সারারাত শান্তি পেলাম না। মনে মনে ভাবলাম, এ বাসায় আর থাকবো না। মেসে গিয়ে উঠবো। ভোরে অর্থাৎ ২৯শে মার্চ অফিসে গেলাম। আজ গেটে থামিনি। আফজালের কথা মনে হলো ওসব মিথ্যে পড়ে লাভ নেই। কারপার্কের নিকট পৌঁছতেই দেখি, ডিএমওর সঙ্গে আফজাল প্রধান সেনাপতির অফিস থেকে বের হচ্ছে। হাত ইশারা করলো। ডিএমও এমএস ব্রাঞ্চে ঢুকলেন। আমি সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়ালাম। কাছে এসে আফজাল ওর এক আত্মীয়ের পেনশনের জন্য একটা কাগজ দিয়ে বললো, মেজর জিয়া ভি সদর বন গেয়ে। তো তোমহারা পিও আব কোনো হোগা মেজর জিয়া ইয়া মুজিব। বাঙালিও নে

আচ্ছা খেল দেখলায়ে দোস্ত। চিঠিটা বাই হ্যান্ড নিব। ওর কথায় ভাবনায় পড়লাম। অফিসে লোকজন তখনো তেমন আসেনি। আলমারি খুলবো সুপারেন এমও পরিদপ্তরে যেতে বললেন। আমি গেলাম। কিন্তু আজ সারাটা পথ কেমন যেন ভয় ভয় লাগলো। মনে হলো বিপদে ফেলার জন্য এরা বোধ হয় আমাকে এ কাজে লাগিয়েছে। আগরতলা কেসের মতো ব্যাপার স্যাপার হতে পারে। তাই মনে মনে খুব সতর্ক হলাম। আজ পোস্ট অফিসের রাস্তা দিয়ে গেলাম। সেনাপ্রধানের অফিস অতিক্রম করতেই জেনারেল গুল হাসানের সামনে পড়লাম। মাথা ঝুঁকে সালাম নিলেন কিন্তু কেমন যেন বাঁকা চোখে দেখলেন। আর যারা দেখলেন তারাও কিছু বললেন না। ভোর বেলা রাস্তা কেমন ফাঁকা। সেনাসদরের অর্ধেক অফিস রাতে কাজ করে। তারা সকালে আধা ঘন্টা বিলম্বে আসে। এমওর সুপারেন আগের মতোই বসতে দিয়ে ভিতরে গেলেন। তার টেবিলে অনেক ফাইল। ছিদ্দিক (পরে মেজর) দূর থেকে হাত ইশারা করলো। কিন্তু কাছে এলো না। ঠিক এমন সময়ে পাশের রুম থেকে (হার্ডবোর্ড দিয়ে পার্টিশন) আলাপ শুনতে পেলাম। হাবিলদার নিয়াজ বলছে, আব বেটা মজা খা আজাদি মাঙ্গতা হ্যায়- দো দিন ইলেট্রিক শক খানে সে সব ঠিক হো যায়ে গা। আর একজন (চিনতে পারিনি) বললেন, আঃ বেচারা মুজিব বহুত সখত আদমি, বেহুঁস হোনে সে ভি মু খুলতা নেহি------- । হামারা উজিরে আলা হোনা থা- সবাই মিলে হাসা হাসি করে। ওদের কথা বার্তায় বুকটা হঠাৎ চিন চিন করতে লাগলো। কে একজন বললো, মুজিবকো দেখনে কো খায়েশ হোতা- বেচারা আব কেইসা হোঁ। এমন সময় টেপ থেকে কর কর শব্দ ভেসে এলো। মনে হলো টেপ রের্কড অথবা ক্যাসেট অন করেছে। একটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর "হ্যালো হ্যালো কান্ট্রিমেন- হেয়ার ইজ এ ফ্লাশ মেসেজ- বঙ্গবন্ধু হ্যাজ ডেকলেয়ার্ড দ্যা ইন্ডিপেনডেন্স অব বাংলাদেশ। হিজ মেসেজ- (ঘর ঘর শব্দের পর) From today Bangladesh is independeent.......ঘর ঘর শব্দ। I call upon the people of Bangladesh .... ওরা বার বার বাজায় কিন্তু শেষ করে না । চুপচাপ শুনলাম। কথাগুলো লিখে রাখতে ইচ্ছা হলো। তবে কিসের একটা ভয়ও লাগছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে বৈদ্যুতিক শক দিচ্ছে মনে হতেই বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকে। ২৬শে মার্চ সকালে আফজাল বলেছিল, বঙ্গবন্ধু আলাদা রাষ্ট্র ঘোষণা দিয়েছেন, আতা ভাবিও বলেছিলেন। লিপি ভাবি শুনেছেন। তা-হলে এটা কি বঙ্গবন্ধুর সেই ঘোষণা। কিন্তু আওয়াজটা ঠিক বঙ্গবন্ধুর মনে হলো না। মনের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল। বেশি দেরি করে সুপারেন বড়ো একটা খাম আমার হাতে দিয়ে বললেন, তোমাদের পরিদপ্তরে আর লোক নেই বার বার তোমাকেই পাঠাচ্ছে কেন ?

খামটা নিয়া দ্রুত এসে পরিচালককে দিলাম। মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন বঙ্গবন্ধু এখন কোথায় কি অবস্থায়? তাকে কি বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হচ্ছে ? ইস্ট পাকিস্তানের আসল অবস্থা কি ? কর্নেল এম আর চৌধুরীর পেনশন বাতিল হলো কেন? তেরা এক বাঙালি নে গাদ্দারি কিয়া- কে সেই বাঙালি ? ওসমানী মারা গেছেন না পালিয়েছেন ? মেজর জিয়া কি এদের অ্যাজেন্ট হয়ে কাজ করছেন? তিনি কিভাবে সেনাপ্রধান,

রাষ্ট্রপ্রধান হলেন? ইস্ট পাকিস্তানে সত্য সত্যই কি দুই দল হয়ে গেছে? আব তেরা পিও কোনো হোগা - মুজিব, জিয়া ইয়া ইন্দিরা ? এই প্রশ্ন পাঞ্জাবিরা কেন করছে? তবে কি মেজর খালেদের কথাই ঠিক- জিয়া এদের লোক? মুক্তি আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করছেন - দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করছেন ? এরা ত জিয়ার বিচার দাবি করছে না। কোনো উত্তর পাই না - মাথাটা বোঁ বোঁ করে।

২৯ মার্চ ১৯৭১ থেকে ৭ এপ্রিল ১৯৭১ মিলিটারি হাসপাতাল রাওয়ালপিন্ডি ভর্তি ছিলাম। ৪ এপ্রিল ১৯৭১ আমার কোর্সমেট নায়েক আবদুল লতিফ খান পাঠান কথা প্রসঙ্গে কর্নেল এম আর চৌধুরীর পেনশন বাতিল হবার জন্য দায়ী ব্যক্তির নাম বলেছিল। ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৭১ আমার সুপারেন সুবেদার ফকির মোহাম্মদ এসিসি ঐ একই ব্যাক্তির নাম বলেছিলেন। আসলে সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের মনে আশা জেগেছিল যে, পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হলে তারাও স্বাধীন হবে। এ-জন্য মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালি-পাঠান একটা অলিখিত ভাব হয়েছিল।

"জয় বাংলা"

তথ্য নির্দেশ

১) আলী : পুরা নাম আলী আহমেদ তালুকদার। এসিসি নং ৭১৩০৭৩১, চট্টগ্রামবাসী। বাংলাদেশে নায়েব সুবেদার পদোন্নতি শেষে রংপুর স্টেশন হেড কোয়াটারে কর্মরত অবস্থায় ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর বিদ্রোহী পথভ্রষ্ট সৈনিকরা তাকে গুলি করে হত্যা করে।

২) সুলতান : হাবিলদার মেজর সুলতান আহমেদ ইস্ট বেঙ্গল। স্বাধীন বাংলাদেশে অনারারি ক্যাপ্টেন হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।

২ (ক) আকবর : ল্যান্স নায়েক আলী আকবর, ই বেঙ্গল।

২(খ) শামসুল হক : হাবিলদার শামসুল হক, ই বেঙ্গল।

২(গ) তাজুল ইসলাম : নায়েক তাজুল ইসলাম, ই বেঙ্গল, (১৯৭১ এ নায়েব সুবেদার হিসেবে শহীদ হন)

৩) হাবিলদার মমতাজ উদ্দিন, এ সি সি। ১৯৫৮ সালে এএসসি সেন্টার, চাকলালায় পরিবারসহ কর্মরর্ত ছিলেন। তার বড়ো ছেলে শামস (বাংলাদেশে কর্নেল হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন) মিলিটারি একাডেমি কাকুলে ক্যাডেট হিসেবে প্রশিক্ষণরত ছিলেন।

৪) মমতাজ নং ৭১৩০৭৩৩ রিক্রুট মমতাজ উদ্দিন, গ্রাম-মুনজিয়া, ডাকঘর; রায়কালী, জেলাঃ জয়পুরহাট, বাংলাদেশে সুবেদার হিসেবে অবসর গ্রহণ।

৫) সোহরাওয়ার্দী : হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী।

৬) ডাক্তার : মেজর দত্ত রিক্রুটিং অফিস কুমিল্লা মেডিকেল অফিসার ছিলেন। ৬(ক) আর ও : মেজর রিক্রুটিং অফিসার কুমিল্লা।

৭) ইব্রাহিম : সিরাজগঞ্জে বাড়ি। প্রশিক্ষণ-পরবর্তী সামরিক চাকরি ছেড়ে করাচিতে বেসামরিক চাকরিতে যোগ দেন। তার একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি বার বার চাকরি পরিবর্তন করেন। ১৯৭৪ সালে তার সঙ্গে একবার দেখা হয়েছিল। তিনি সেনাসদর লাইনে বন্ধু জামালের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তখন তার চাকরি অদলি বদলি হয়েছে ৭৯ বার এবং তখন একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা।

৭(ক) শামসুল হুদা : বাংলাদেশে সুবেদার মেজর হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তার মেয়ে ডাক্তার এবং জামাই ব্রিগেডিয়ার। হুদার বড়ো ভাই কর্নেল সামসুদ্দিন, এএমসি (অব.) ডিওএইচএস মহাখালী বসবাস করছেন।

৮) ফজলু : মোহাম্মদ ফজলুল হক - বাংলাদেশে হাবিলদার হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। সেনাকল্যাণ সমিতি নামে অবসর গ্রহণকারী সৈনিকদের নিয়া একটি সংগঠন করে এবং অবসর গ্রহণকারী সৈনিকদের নেতা হয়ে যান। কিন্তু সংগঠনটি সরকারি অনুমোদন পায় না। এজন্য তাকে জেল খাটতে হয়েছে। সংসারে সৎমায়ের দুর্ব্যবহারে বাড়ি ছেড়ে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন।

৯) এ এইচ এম কামরুজামান (হেনা ভাই) : আমাদের এলাকা-চমরুলের নূরজাহান আপার স্বামী। পরর্বতীতে আওয়ামীলীগের নেতা ও মন্ত্রী। বঙ্গবন্ধু হত্যা পর জাতীয় নেতাদের সঙ্গে তাকেও পাকিস্তানি দালালেরা হত্যা করে।

১০) কর্নেল সিরাজ এএমসির ডাক্তার বাংলাদেশের মেজর জেনারেল হয়েছিলেন।

১১) ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট - লেখক

১২) মজিদ (অব.)- পাকিস্তানি মেজর জেনারেল আবদুল মজিদ, সিলেট বাড়ি।

১৩) লে. জেনারেল গুল হাসান-রাওয়ালপিন্ডি ক্লাবে সর্বদক্ষিণের অংশে তিনটি কামরা ৫,৬,৭। বলা হত এটা ব্যাচেলার অফিসারদের লাউন্স। ৫ নম্বরে থাকতেন কর্নেল ওসমানী, ৬ নম্বরে ব্রিগেডিয়ার শরিফ এবং ৭ নম্বরে থাকতেন জেনারেল গুল হাসান। আর এ ত্রয়ের মধ্যে খুব ভাব ছিল। ব্রিগেডিয়ার শরীফ প্রায় সময় বারান্দায় বসে পড়াশুনা করতেন। আমাকে দেখলেই বলে উঠতেন, টাইগার তুমহারা বাঙলা বাবু এসেছে।

১৪) স্কোয়াডেন লিডার পরে এয়ার কমোডোর গাজীউর রহমান

১৫) আলহাজ্ব সৈয়দ আলী মণ্ডল- গ্রাম বড়োগাছা, ডাকঘর : মোহনপুর, উপজেলাঃ আক্কেলপুর, জেলাঃ জয়পুরহাট - একজন ব্যবসায়ী। প্রথমে কলকাতায় পরে বগুড়া শহরে। শেষ জীবনে গ্রামের বাড়ি। মৃত্যু ১৯৯২ সালে। কলকাতায় মুসলিম লীগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পরে বৃহৎ বঙ্গ আন্দোলনের কর্মী ছিলেন। বঙ্গভঙ্গের পর খুব মর্মাহত হন। বগুড়া শহরে শ্বশুর বাড়ি ফিরে ব্যবসা শুরু করেন এবং রাজনীতি থেকে বিরত থাকেন। তবে বৃহৎ বঙ্গের জন্য আজীবন উৎসাহী ছিলেন। সেই সূত্রেই ডঃ ইব্রাহিম, বঙ্গবন্ধু এবং সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। দু-বার হজ্ব করেছেন এবং দু-বারই পবিত্র মক্কা-মদিনায় দুই বাংলা এক করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন।

১৬) ইন্সপেক্টর আবদুল আজীজ- (পরে এএসপি) স্বাধীনতা উত্তর গণভবনে তথা বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেছেন। তখনকার হুইপ সরদার আমজাদ হোসেন ক্লাসমেট।
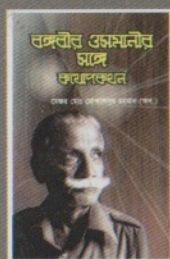
Bongobir Osmaner
Songe Kothopokothon

by

Mejor Md. Mokhlesur Rahman (Retd.)

Cover : Md Aminul Islam

Price : BDT 100; USD $1.50

ISBN: 978 984 11 07116